

অগ্নিসাক্ষী

প্রবোধকুমার সান্যাল

ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৭

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২৮, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী
রণেন আয়ন্ দত্ত

ব্লক
সিগনেট ফোটোটাইপ

ব্লক-মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিণ্টার্স

বাঁধাই
তৈফুর আলী মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বার্তাসম্পাদক

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

প্রীতিভাজনেষু

এই লেখকের :

বেলোয়ারী
মহাপ্রস্থানের পথে
দেশ-দেশান্তর
অরণ্যপথ
তুচ্ছ
নদ ও নদী
আঁকাবাঁকা
জল কল্লোল
উত্তরকাল
আগ্নেয়গিরি
দেবতাত্মা হিমালয়
বন্যাসঙ্গিনী
হাস্নুবানু
বনহংসী
কল্পান্ত
নওরঙ্গী
মল্লিকা
শ্যামলীর স্বপ্ন
বন্দী-বিহঙ্গ
স্বাগতম
রঙীন সুতো
ঝড়ের সঙ্কেত

দুর্গাপুর স্টেশনে গাড়ি যখন থামল, রাত নটা। সঙ্গে একটি পুরনো এটাচি কেস ছাড়া আর-কিছু ছিল না। রমেন একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল, আজ শনিবার, সকাল সকাল দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এখন কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে আবার বেরিয়ে এসে হোটেলে ঢুকতে কিছু সময় লাগবে। তার চেয়ে এক মুঠো খেয়ে কাজ মিটিয়ে যাওয়াই ভাল।

স্টেশন ছাড়িয়ে পূবদিকে ফিরলেই দুর্গাপুরের পুরনো বাজার—বাজার যেখানে শেষ হয়েছে তারই কাছাকাছি গোলোক সামন্তর দোকান। এ দোকান আজকের নয়। পনরো বছর আগে এখানকার বাজারে যখন তেলের আলো টিমটিম করত, তখন এসে গোলোক সামন্ত এখানে ঘাঁটি আগলে বসে গেছে। তখন যুদ্ধের হুজুগে দেশ আড়ষ্ট।

রমেন সোজা এসে সামনের চাতাল পেরিয়ে চালাঘরে ঢুকল। জন দশ-বারো লোক তখন খেতে বসেছে। সামনের সেই নড়বড়ে চৌকিখানার ওপর বসে নন্দদুলাল খাতা ওলটাচ্ছে এবং গোলোক সামন্ত স্বয়ং বাক্সটির সামনে বসে পরিবেষণের তদ্বির-তদারক করছে। রমেন এসে চৌকির ধারে এটাচি কেসটি রেখে ক্লান্তকণ্ঠে বলল, মিথ্যে রেল ভাড়াটাই খরচ হয়ে গেল। মেয়েছেলে বলে দিয়েছে কোন্ কথা কার কানে, আর তারই পেছনে আমাকে তোমরা ছুটিয়ে হয়রান করলে।

গোলোক বলল, দাঁড়ান বাবু শুনব সব। আমি পাই-পয়সা গুনে কারবার করি, অত বেহিসেবী আমাকে মনে করবেন না। বলি, ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন ?

রমেন বলল, কলকাতা শহর, ঠিকানা খুঁজে পাব না ?

বেশ, একে একে শুনব। মেয়েছেলেকে তাচ্ছল্য করছেন, কিন্তু সে মেয়েছেলে সোজা নয়। ওই নন্দটাই কিছু একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে, ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারে নি।

নন্দদুলাল এবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে সে বলল, আমি কী করব? আমি যেমন শুনে এলুম তেমনি খবর দিয়েছি। মেয়েছেলে হয়ে ইঞ্জিনীয়ারের কানে কানে কী বলে দিয়েছে, আমি কেমন করে জানব?

গোলোক চাপা কণ্ঠে ধমক দিয়ে বলল, ভদ্দলোকের ছেলেটা অসুবিধেয় পড়েছে, তুই নিজে কেন একবার ঠাকরুনের কাছে গেলি নে?

আমি যাব?—কলমটা রেখে নন্দ বলল, আপনি কি তার মেজাজ মর্জি জানেন না? আমাকে দেখলেই জ্বলে ওঠে। কথা কইতে গেলেই বলে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে! আমার যাবার মুখ নেই।

অদূরে খদ্দেররা খেতে বসে নিজেদের মধ্যেই গল্পগুজব করছিল, সেই দিকে একবার তাকিয়ে গোলোক বলল, শুনলেন বাবু, ছোঁড়াটার কথা শুনলেন? যাবার মুখ নেই, তবে আজ বাদে কাল ওই প্যাঁচামুখে শুভদিষ্টি করবি কী করে? সবই করলুম, মুড়কির দোকান থেকে চপ-কাটলেট পর্যন্ত এগিয়ে এলুম, কিন্তু তোকে মানুষ করতে পারলুম না নন্দ।

নন্দ আর কোনও কথা বলল না, শুধু কলমটা আবার তুলে নিয়ে খাতাখানার উপর মুখ নিচু করে রইল।

গোলোক পুনরায় বলল, আপনি ভাববেন না বাবু, আমি কথা দিচ্ছি। বুঝতে পারছি আমাদের ওই লাটুরাম ওকে ধাপ্পা দিয়েছে, আর তাতেই আপনার এই হয়রানি। আমাকে দিন-দুই সময় দিন।

ব্যাপারটা একটু জটিল বলেই রমেনের মনে হচ্ছিল। সামনে

মাত্র এই কটা দিন। ও-মাসের পয়লা থেকে চাকরি আর তার থাকবে না। স্টোরের বড়বাবু পরিষ্কার করেই তাকে কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন। এখন একমাত্র ভরসা, যদি অন্য সেক্‌শনে সে বদলি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্য দিকে আর-একটা কৌতূহল রমেনকে পেয়ে বসেছিল। তার এই সুপারিশের সূত্র ধরে কদিন থেকেই বিশেষ একটি স্ত্রীলোকের উল্লেখ শোনা যাচ্ছে, এটি একটু বিচিত্র। এক কুলি-কামিন বাদে সমগ্র দুর্গাপুর অঞ্চলে কোনও উল্লেখযোগ্য মেয়েছেলের চিহ্নমাত্র আছে, এটি রমেনের জানা ছিল না। এবার সে হাল্কা হাসিমুখে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, সামন্ত মশাই, তুমি যে মেয়েছেলের কথা বলছ, তিনি আবার কে? কদিন ধরেই শুনছি, কে তিনি? আমার চাকরি বজায় রাখার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিসের? লাতুরামই বা কে?

খদ্দেরদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তারা সব একে একে উঠতে আরম্ভ করেছে। গোলোক একবার তাকাল নন্দর দিকে। পরে হাসিমুখে বলল, বাবু, আমি কিছু না বললেই বোধ হয় ভাল হয়; বলতে গেলে আজও তিনি আমার মনিব ঠাকরুন। জিজ্ঞেস করুন আমার ওই গুণধর শালাটিকে। ও তাকে চেনে হাড়ে-হাড়ে।—যাক, আমি দেখছি আপনার ব্যাপারটা। বলি, ও ক্ষ্যান্ত, এঁটোপাত তোল তাড়াতাড়ি—বাবুর ঠাঁই করে দাও, রাত হয়েছে।

মাথা-পিছু বারো আনা হিসেবে খদ্দেররা পয়সা হিসাব করে দিচ্ছিল। বোধ হয় ওদের মধ্যে কেউ একজন মাছের ঝোল সম্বন্ধে কিছু একটা কটাক্ষ করে থাকবে, গোলোক তৎক্ষণাৎ বাঁকা চোখে তাকাল। বলল, হ্যাঁ, ওইটুকুই মাছ। বেশী চাইলে ওই দামোদর দেখিয়ে দেব। তোমরা উড়ো খদ্দের, আজ আছ কাল নেই। বাঁধা খদ্দের নিয়েই আমার ব্যবসা, বুঝেছ?

তাই বলে ভাঙা মাছ খাইয়ে পুরো দাম নেবে ?

পুরো দাম কোথায় দিচ্ছ গো, দামটাও তো ভাঙা। পাতা-পিছু আরও চার আনা দাও, আস্ত মাছ দেব বইকি। সেদিন কি আর আছে ভাই যে, দু আনা ফেললে ভরপেট খাওয়াব ? এখন পাতা-পিছু দশ আনা নিয়েও খরচা পোষাতে পারি নে। যাও না আমার ওই নতুন দোকানে—ওই যে ওপারে মার্কেটের গায়ে—দেখবে কলাইয়ের থালায় ভাত দেব, টেবিল চেয়ারে বসাব, মাথার ওপর পাখা ঘুরবে,—মাথা-পিছু একটি করে টাকা। এখন হল ভাতের দাম, পয়সার দাম কি আর আছে ?

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কেউ যাবে পানাগড়, কেউ বা রানীগঞ্জের দিকে। খদ্দেররা একে একে বেরিয়ে গেল।

রমেন আজ প্রায় দেড় বছর ধরে খাচ্ছে গোলোকের দোকানে। নতুন শহরের বড় দোকানেই তার খাওয়া অভ্যাস, এখানে আসে ক্বচিৎ কখনও। সে মাসকাবারী খদ্দের। দু বেলা খায়, মাসে বত্রিশ টাকা। তার সঙ্গে অন্য সম্পর্ক।

আসনের উপর গিয়ে রমেন খেতে বসল। জন তিনেক আরও বাকী ছিল শেষ কুড়ন্ত, তারাও আশেপাশে বসে গেল। গোলোক বলতে লাগল, ছুটো খদ্দেরের কথা শুনলেন বাবু ? গা একেবারে জ্বলে যায়। পনেরো বছর আগে যখন ওই কদমগাছটার তলায় এসে চালাঘর তুললুম, বিশ্বাস করুন বাবু, মুড়ি-মুড়কি ছাড়া খদ্দের নেই। ছ মাস পরে তেলেভাজা খাবার ধরলুম। দামোদরের ওদিকে তখন মাটি কাটা চলছে, সাহেব-সুবোরা যাচ্ছে আসছে, জরিপের কাজ চলছে। শালের জঙ্গল পেরিয়ে এসে তখনও ডাকাতি-রাহাজানি হয়—পৈতৃক প্রাণটা আমাদের ধুকধুক করতে থাকে। দেশে আকাল, মহামারী—যুদ্ধ চলছে, মানুষ মরছে চারদিকে। নন্দর বয়স তখন বছর বারো। তখন আর তাকাব

কোন্ দিকে! এই দোকানটিই তখন ভরসা। বউ ভাজে বেগুনি ফুলুরি, আর নন্দ বাসন মাজে। এমনি করে বছর তিনেক গেল, তখন ভাতের হোটেল বসালুম। তবে হ্যাঁ, ট্যাঁ-ফোঁ করবার কেউ ছিল না। নিজে জায়গা কিনে নিজের খরচে ঘর তুলেছি। বলতে পারবে না কেউ। কারও কথার ধার ধারি নে।

খেতে খেতে রমেন বলল, জায়গা-জমি তখন বোধ হয় কিছু সস্তাই ছিল!

হ্যাঁ, তা ছিল বইকি। তবে হ্যাঁ, টাকাটা অবিশ্যি পকেট থেকে দিতে হয় নি। সতীলক্ষ্মীর কপালগুণে হাতে এসেছিল।

কেউ দান করেছিল বুঝি?

এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে গোলোক বলল, অনেকটা তাই বটে, তবে হ্যাঁ, দান ঠিক নয়—ওই আর কি! খামকা মানুষের দানই বা হাত পেতে নিতে যাব কেন বলুন? তাই লেখাপড়া একটা করে দিয়েছিলুম বইকি। দানই বল, আর ধার-কর্জই বল, ওই লাছুরাম বেটা সবই জানে। সে তখন এক সময় বলব বাবু, সে অনেক কাহিনী। ওই তারই মেয়ের কথাই তো বলছিলুম তখন। আমি ছিলুম মুখুজ্জেদের ঘরোয়া গোমস্তা।

রমেনের মনোযোগ বিশেষ ছিল না। কোনমতে আহারাদি শেষ করে সে উঠে পড়ল। তারপর হাত মুখ ধুয়ে এসে বলল, এবার চললুম সামন্ত মশাই—একটু দেখো, দশটা টাকা যেন আমার গচ্ছা না যায়! খরচ আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে।

আমি কথা দিচ্ছি বাবু। তুমি আমার মাসিক খদ্দের, তোমার কাজটা টিঁকে থাকলে আমারও লাভ। কথাটা কী জান, মেয়ে-ছেলেটার মন যদি পাওয়া যায়, আর-কিছু ভাবতে হবে না। ওরই মায়ের কাছে আমি যে চাকরি করতুম। আচ্ছা, সে হবে। তুমি যাও এখন, আমি দেখছি।

আলোচনাটুকুর মধ্যেই সম্ভাষণটা সে বদলে নিল।

এটাচি কেসটি নিয়ে রমেন বেরিয়ে চলে যাবার পর নন্দ মুখ তুলল। বলল, আপনার চেষ্টা মিথ্যে হবে জামাইবাবু, আমাদের কাউকে ও-মেয়েমানুষ আমল দেবে না। লাছুরাম অত করে ওর জন্যে, তাকেও বিশ্বাস করে না। শুধু শিং বেঁকিয়ে তেড়ে আসে।

থাম্ তুই মেনিমুখো।—গোলোক ধমক দিয়ে উঠল, মেয়েমানুষের মন পেতে গেলে কী করতে হয় জানিস? আমি যা শিখিয়ে দেব তাই গিয়ে বলবি। ছুটো মুখের কথা। ওতে যদি ভদ্দলোকের চাকরিটা বেঁচে যায়, কেন করবি নে? এত বড় কারবার ফেঁদে বসলুম কিসের জোরে? মেয়েমানুষের সাহায্য ছাড়া হয় কিছু? ওর সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে তবে আমি ছাড়ব। দু কুল রক্ষে হবে।

ক্ষীণকণ্ঠে নন্দ আবার বলল, আপনি যা ভাবছেন তা হবে না। ওকে আপনি বাঁধতে পারবেন না।

আমি কেন বাঁধব? বাঁধবি তুই। যদি না পারিস তবে হাতে কাচের চুড়ি পরে ওই ক্ষ্যান্তর সঙ্গে বাসন মাজতে বসিস। পুরুষ জাতের ওপর তুই ঘেন্না ধরিয়ে দিলি নন্দ।

নন্দদুলাল চুপ করে রইল।

একখানা নড়বড়ে চৌকি, ছোট একটি টেবিল এবং হাতল-ছাড়া একখানা চেয়ার—এ ছাড়া করোগেটের ছোট চালাঘরটিতে যে আলনাটি রয়েছে, তাতেই রমেনের একপ্রকার কাজ চলে যায়। এ ব্লকটি অবিবাহিত চাকুরেদের জন্য, ফ্যামিলি কোয়ার্টার নয়।

এর আগে কিছুদিন স্টোভ জ্বালিয়ে ভাত ফুটিয়ে খাবার চেষ্টা যে হয় নি তা নয়। ওতে নাকি খরচ কম পড়ে। কিন্তু হঠাৎ একদিন রমেনের জ্ঞানোদয় হল, খরচ কমাতে চায় কার জন্য? কিসের জন্য? তা ছাড়া নির্বান্ধব জীবনে কেবলমাত্র নিজের পেট

ভরাবার জন্য এই বিরক্তিকর পরিশ্রম ও সকাল-সন্ধ্যা রান্নার উদ্বেগ, এর মধ্যে কোথায় যেন আত্মমর্যাদাবোধের অভাব আছে। সুতরাং একদিন সকালে উঠে নিজের হাতে বাসনগুলো ধুয়ে চৌকির তলায় ঠেলে রেখে সে বেরিয়ে এল এবং অনুভব করল, তার চেয়ে স্বাধীন অন্তত দুর্গাপুরে এখন আর-কেউ নেই।

সেই থেকে নতুন শহরের মার্কেটের ধারে গোলোক সামন্তর দোকানের সঙ্গে তার পরিচয়। তা প্রায় বছর খানেক হতে চলল। আশা ছিল চাকরিটা পাকা হলে তারও এখানে স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় গোড়াতেই ঘা পড়ল। এর পর আবার কোথায় সে দরখাস্ত করবে, এই কথাটি শুধু ভাবতে ভাবতে গত রাতটা সে একপ্রকার জেগেই কাটিয়ে দিয়েছে।

কলকাতায় উমেদারি করতে গিয়ে প্রায় দশটি টাকা তার খরচ হয়ে গেছে, এ দুঃখ তার ভিতরে ভিতরে টনটন করছিল। হাতে যা আছে এ মাসটা তার চলবে কি না সন্দেহ। চায়ের সঙ্গে এক টুকরো রুটি সকালে না খেলে পেট জ্বালা করে। ধোবার খরচ আছে, সন্ধ্যাবেলাকার জলখাবার। সাবান দুখানা মাসে লাগে। জুতোর কালির দাম অনেক। মাথার তেল, দাড়ি কামাবার সাবান। মাসে একটা দিন অন্তত সিনেমা। এ ছাড়া ভবিষ্যতের পুঁজি। চাকরি থাকবে না সেই ভাবনাতেই তার সঞ্চয়ের আগ্রহ। নিজের দায়িত্ব নিজে ছাড়া আর কে বইবে? অসুখ-বিসুখ করলে দেখছে কে?

পাছে অসময়ে ক্ষিধে পায় এজন্য রমেন সজাগ ছিল। সকালের হাওয়া এখনও স্নিগ্ধ, বাঁধের দিককার চওড়া পথটা ধরে আপন মনে হাঁটতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু রুটির টুকরো পাছে দ্রুত হজম হয়ে যায়, এজন্য বেশীদূর হাঁটতে তার ভরসা হল না। আজ রবিবার, হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করার দিন। বিকেলের দিকে ক্লাবে খুব হৈ-চৈ চলবে। সম্প্রতি একখানা নাটকের মহড়া চলছে।

যারা ফ্যামিলি কোয়ার্টারে থাকে, তাদের ওদিকে গেলে আজ মাংস-রান্নার গন্ধ পাওয়া যায়।

রমেন হাঁটতে হাঁটতে আবার ফিরে এল এবং এদিক্ ওদিক তাকিয়ে কোন কাজ হাতের কাছে না পেয়ে সে নিজের ঘরটিতে এসে ঢুকল। পাশের ঘরগুলো প্রায় খালি। গত শনিবার তিনটের গাড়িতে কেউ গেছে বর্ধমান, কেউ আসানসোল, কেউ রানীগঞ্জ—আর যাদের মাইনে কিছু বেশী, তাদের কেউ কেউ গেছে কলকাতায়। ওদের মধ্যে অনেকে বিবাহিত, তারা প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় স্ত্রীদের কাছে না পৌঁছতে পারলে এক সপ্তাহ ধরে খুঁতখুঁত করতে থাকে। তাদের সতী-সাবিত্রী বউরা সেদিন নাকি ফুরফুরে শাড়ি জড়িয়ে পাউডার মেখে আশাপথ চেয়ে অপেক্ষা করে।

মুখ ফিরিয়ে রমেন চৌকির উপরে ঘণ্টা তিনেক পড়ে রইল। তার সমস্ত ভাবনার উপরে দশটা টাকা যেন ছুঁচের মত বিঁধছিল।

স্বল্পবিত্ত সাধারণ ছেলে সে। পিসির ওখানে খেয়ে পরে সে মানুষ। বিপত্নীক বুড়ো বাপ মরেছে আজ ন বছর হল। আই-এ পর্যন্ত পড়ে টুইশনি ধরেছিল, কিন্তু সুবিধে হয় নি। মাইনর স্কুলে কিছুদিন বাংলা পড়িয়েছিল, কিন্তু স্কুলটা উঠে গেল। হিসাব-নবিশের একটি কাজ নিয়েছিল সে হুকুমচাঁদের কারখানায়, কিন্তু যাতায়াতের গাড়িভাড়ায় অর্ধেক মাইনে চলে যেত। টাইপ-রাইটিং একটু সে শিখেছে বটে, কিন্তু আজও সেটি কাজে লাগে নি। জোর করে সে দাবি জানায় না, দুর্ভাগ্যের ভয়ে সে ভীরুপ্রকৃতি, চোট খেলে সে শুয়েই থাকে। তার নিরীহ প্রকৃতি সকলের পিছনে সরে থাকতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়। রমেনের চেহারা বলিষ্ঠ, বুকের ছাতি চওড়া, কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই শীর্ণ। একটি নিরাপদ চাকরি, দু বেলা বাঁধা অন্ন, নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয় এবং নিরুদ্বেগ দিনযাত্রা—এই হলেই সে খুশী।

একটা সময় উঠে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে স্নানাহার সেরে নিল। নতুন শহরে গোলোক সামন্তর দোকান বেশ জ্বল-জ্বলাট। লম্বা খাবার টেবিল, কাচের গেলাস, মাথার উপরে ইলেকট্রিক পাখা, হাত ধোবার বেসিন, পরিচ্ছন্ন রান্নাবান্না—ভাত, রুটি, লুচি, মাছ, মাংস যা চাও। কর্মচারীরা আছে, পাচক বামুন রয়েছে, চাকরে দই এনে দেয়, বাইরে বেরোলেই পান-সিগারেটের দোকান। ওরই মধ্যে মারাঠী, গুজরাটী আর দক্ষিণীদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। ত্রুটি চোখে পড়ে না কোথাও।

গোলোক নিজে উপস্থিত নেই। রবিবারটায় তাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আজ লোকজনের ভিড়ও কম। নন্দ থাকে পুরনো বাজারের দোকানে। এখানকার 'স্টাফ' আলাদা। রমেন তার আহারাদি সেরে খাতায় সই করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। দুপুরবেলাটা বিশ্রাম, বিকালের দিকে বাঁধের ওদিকে বেড়াতে যাওয়া। সন্ধ্যার দিকে ক্লাবে গিয়ে ঢোকা। সন্ধ্যারাত কোনমতে কাটিয়ে আসা। তারপর একলা অন্ধকারে শুয়ে স্বপ্নের জাল বোনা।

বিকাল সাড়ে পাঁচটা তখনও বাজে নি। রমেন বেরোবার উপক্রম করছিল এমন সময় বাইরে গোলোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল ঃ বলি, কই গো রমেনবাবু—এই যে আমরা, একবার বেরিয়ে এস দাদা—

রমেন এগিয়ে আসতেই দেখে গোলোকের সঙ্গে নন্দও হাজির। গোলোক বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে, কিচ্ছু ভেবো না রমেনবাবু। যা বলি তাই শোন। তবে এও জেনো, স্বার্থ ছাড়া এ শর্মা এক পা-ও নড়ে না। বুঝলে দাদা, তুমি আমার জন্যে আর আমি তোমার জন্যে। এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই ভায়া।

কী ব্যাপার? হঠাৎ এমন সময় যে?

নন্দ বলল, আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

আমাকে ? কোথায় ?

হো-হো করে গোলোক সামন্ত হেসে উঠল, বলল, পোড়া ছুটো ঠোঁটের ডগায় তামাশাটা এসে পড়েছে—বলেই ফেলি। যেতে হবে বৃন্দাবনে।

রমেন হাঁ করে চেয়ে রইল। গোলোক তার হাসি থামিয়ে বলল, হ্যাঁ, আর দেরি নয়, শুভস্য শীঘ্রম্। নন্দ সঙ্গেই রইল, ও যা করবার করবে। তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই রমেনবাবু। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে বলেই তো বলছি। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। মেয়ে-ছেলেটা বড় ট্যাঁকখরো, যদি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কয়, চুপ করে থেকো। তোমার কাজটা হলেই হল, বুঝেছ ? যে-গরু ছুধ দেয়, তার চাট না হয় ছু-একটা খেয়েই এলে। তা ছাড়া তুমি হলে বাইরের লোক, তোমার সঙ্গে সম্পর্কই বা কী! নন্দ সব ম্যানেজ করবে।

রমেন প্রশ্ন করল, কোথায় যেতে হবে ?

এই তো এই রানীগঞ্জে, যাবে আর আসবে। ছটার ট্রেনে যাচ্ছ, দশটার মধ্যেই আবার ফিরে আসবে। নন্দ, গাড়িভাড়াটা তুই-ই খরচ করিস, বাবুর পকেট থেকে না যায়। তা হলে আর দেরি নয়, গাড়ির সময় হল, এই বেলা বেরিয়ে পড় বাবু।

থমকে দাঁড়াল রমেন। বলল, আমার চাকরির সুপারিশে নন্দ যাচ্ছে, গাড়িভাড়া তো আমারই দেওয়া উচিত সামন্ত মশাই।

আ কপাল! তবেই চিনেছ তুমি গোলোক সামন্তকে। তোমার চাকরি ঠিকই পাকা হবে, কিন্তু আমার নিজের কাজই যে চোদ্দ আনা।—গোলোক বলল, বাবু, আমি কি আর গায়ে পড়ে উপকার করতে এসেছি ? তুমি সবে গোঁফ কামাতে শিখেছ, আর আমার চুল পেকে ঝরে গেল।

এবার রমেনের মুখে হাসি দেখা দিল। বলল, তোমার কাজটা কী ধরনের, একটু বলই না সামন্ত মশাই ?

আমার কাজ।—গোলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে একবার অন্য দিকে তাকাল, পরে বলল, বাবু, মন যদি পাই তবেই রক্ষে, নইলে গোলোক সামন্তর তাসের ঘর দমকা হাওয়ায় উড়ে যাবে। যাক, আর দেরি নয়, এবার দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়। নন্দ, সব কথা খুঁটিয়ে মনে রেখে যা করবার তাই করে আসবি, বুঝলি? যাই, আমাকে আবার এ হোটেলে বসতে হবে।

গোলোক তাড়াতাড়ি বিদায় নিল।

স্টেশন কাছেই। নন্দর সঙ্গে হন হন করে ছুটল রমেন। সোজা গিয়ে রাস্তার বাঁক ঘুরে বুকিং আপিসে টিকিট কিনে প্ল্যাটফরমে এল। গাড়ি এসে তখন ঢুকছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ি। থামল মাত্র দু মিনিট। অতঃপর ঠিক ছটায় ছাড়ল। একটি কোণে গিয়ে রমেন নন্দর পাশে বসল। সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে কিছু একটা জটিল গোলকধাঁধা রয়েছে, সেটির জট ছাড়ানো রমেনের সাধ্য নয়। কিছু কিছু আভাস আছে, কিছু বা অনুমান। কোথাও রয়েছে একটা চাপা চক্রান্ত, সেটা নারীঘটিত, কিন্তু তার ধরা-ছোঁওয়া নেই। এর মধ্যে একমাত্র আশ্বাসের কথা এই, যদি তার চাকরিটা বহাল থেকে যায়! রমেন শুধু মনে মনে ভাবছিল, কোনও বিপদ-আপদের মধ্যে সে না জড়িয়ে পড়ে! কতকগুলো সাঙ্কেতিক ভাষা বুঝতে না পারায় তার মনে অস্বস্তি ছিল।

এক সময় হঠাৎ সে বলল, ওই যা, ঘরে চাবি দিয়ে আসতে ভুলে গেলুম নন্দ।

নন্দ মুখ ফিরিয়ে বলল, চাবি দেন নি? দামী জিনিস কিছু আছে নাকি?

আছে বইকি।—রমেন জবাব দিল, সাবান-কাচা ধুতিখানা শুকচ্ছে আনলায়, চৌকির তলায় টিনের বাক্সটাও রয়েছে।

টাকাকড়ি আছে বাক্সয়?

না, তা অবিশ্যি কিছু নেই, তবে পুরনো গরম কোটটা রয়েছে, দু-একটা আরও জামা কাপড়। কুলুঙ্গিতে তেলের শিশিটা, বাটার চটি জোড়া—সবই আছে।

ভয় নেই,—নন্দ তাকে আশ্বাস দিল,—চোরের চোখ থাকে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে। তা ছাড়া পাহারাদাররা আছে সব সময়।

এসব সান্ত্বনাবাক্য বড় সুলভ, এতে যথেষ্ট আশ্বাস পাওয়া গেল না। রমেন শুষ্ককণ্ঠে একবার বলল, পাহারাদারদের পাহারা দিচ্ছে কে নন্দ? কিন্তু কী আর করব, যা বরাতে আছে তাই হবে। আচ্ছা নন্দ, আমাদের কাজ হাসিল হবে মনে হয় তোমার?

নন্দদুলাল কেমন যেন ভীরু কণ্ঠে বলল, জামাইবাবু যাই বলুক, আমার একটুও বিশ্বাস নেই।

তা হলে যাওয়া-আসাই সার হবে বলছ? তোমাদের কাজও হবে না?

নন্দ বলল, আমার কাজ না হয়, ফিরে এসে জামাইবাবুকে সব খুলে বলব। আমার আর কিসের ভয়?

তা হলে ভয় পাচ্ছ কেন নন্দ?

নন্দ বলল, ভয় পাচ্ছি কেন! ভয় তাকে কে করে না বলুন তো? কবে একটা মুখ ফসকে কথা বলে ফেলেছিলুম, সেই থেকে আর মাথা তুলতে পারলুম না। ওই জামাইবাবুরই কি মাথা তোলার খ্যামতা আছে নাকি, বলুক তো।

রমেন চুপ করে গেল। অণ্ডালে এসে কতক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, এবার আবার ছেড়ে দিল। এক সময় পুনরায় রমেন বলল, এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। তিনি কেমন মেয়েছেলে বল তো?

গেলেই বুঝবেন,—নন্দ বলল, আমি এতকাল ধরে দেখে আসছি, মোটেই সুবিধের নয়। কথা বলতে গেলেই খিঁচিয়ে তেড়ে আসে।

ও, তা হলে তোমাদের সঙ্গে এত দহরম-মহরম কিসের?

নন্দ বলল, সে বাবু অনেক কথা। জামাইবাবু আমাকে সব খুলে বলে না। ওসব বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার আমি তেমন বুঝি নে।

রমেন প্রশ্ন করল, তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ নন্দ?

লেখাপড়ার সময় পেলুম কোথা বাবু? বাসন মাজলুম আর হোটেল ঝাঁট দিলুম। লেখাপড়া শিখলে একবার দেখে নিতুম।

কাকে দেখে নিতে নন্দ?

আমাকে যারা মানুষ বলে ঠাওরায় না, তাদের।

রমেন এবার চুপ করে গেল। সে নৈরাশ্যবাদী। এখন থেকেই সে জানল, এ লোকটার সঙ্গে আসাও যেমন মিথ্যে, তেমনি অনির্দিষ্ট আশ্বাসের পিছনে ছোটাও হাস্যকর। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আজকের গাড়িভাড়াটা তার লাগল না। রাত দশটার মধ্যে ফিরতে পারলেই সে খুশী থাকবে।

ভাল কথা, ফিরে এসে তোমাদের হোটেলে ভাত পাব তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ আপনার আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। শুধু একটা কথা আপনি জেনে রাখুন।—নন্দ এবার যেন সগৌরবে বলল, আপনার কাজটা গেলেও আপনি জলে পড়বেন না।

রমেন একটু উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কেমন করে জানলে?

জামাইবাবু বলে দিয়েছেন। আপনার মতন লোক পেলে উনি দুটো হোটেলের সব খাতাপত্তর আপনার জিম্মায় দেবেন। ওতেই আপনার চলে যাবে।

আশা ও আশ্বাসের ক্ষীণ রশ্মি রমেনের চোখে পড়ল।

গাড়িখানা যাচ্ছিল অত্যন্ত মৃদুগতিতে। লোক্যাল প্যাসেঞ্জার, কামরার ভিতরে লোক মাত্র কয়েকজন। ঘণ্টাখানেকেরও বেশী লেগে গেল রানীগঞ্জ পৌঁছতে। নামবার আগে নন্দ বলল, ওখানে গিয়ে আমাদের বেশী দেরি করলে চলবে না, ফেরবার গাড়ি হল পৌনে নটায়। দোকানে বসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

রমেন গাড়ি থেকে নেমে নন্দর পিছু পিছু চলল। এক সময় প্রশ্ন করল, স্টেশন থেকে কতদূরে যেতে হবে ?

বেশী দূর নয়। সাইকেল-রিক্‌শায় যাব, পাঁচ মিনিট হয়তো লাগবে।

সাইকেল-রিক্‌শার ভাড়াটা উভয়ের মধ্যে কে দেবে, সেটা ঠিক স্পষ্ট বুঝতে না পেরে রমেন বলল, চল না ভাই নন্দ, হেঁটেই এটুকু চলে যাই—বেশ হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যাবে ?

নন্দ বলল, না না, সে কী কথা! চার আনার তো মামলা, হেঁটে যাবেন কেন ? আসুন, গাড়ি ধরে নিই।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে তুজনে এসে একখানা সাইকেল-রিক্‌শায় চাপল। কিন্তু তখনও স্পষ্ট হয় নি, গাড়িভাড়াটা ঠিক দিচ্ছে কে! ফলে, সমস্ত পথটা রমেন আড়ষ্ট হয়ে রইল, এবং এই ভ্রমণ উপলক্ষ্যে নতুন একটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুই তার চোখে পড়ল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছিল।

পথ সামান্যই। সাইকেল-রিক্‌শাটি যেখানে এসে থামল, সেটির সামনেই মস্ত একটি পাইকারী দোকান। এপাশে ওপাশে খোলা জমি। তারই একটি অংশে তুখানা বৃহদাকার লরি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে যখন নন্দ সাইকেল-রিক্‌শার দরুন চার আনা ভাড়া চুকিয়ে দিল, রমেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। নন্দ একবার ঠাহর করে এদিক ওদিক দেখল। পরে বলল, হুঁ, সায়েব এসেছে দেখছি।

সায়েব কে নন্দ ? কেমন করে জানলে তিনি এসেছেন ?

কালো মোটরখানা দেখছেন না ? ওখানাই সায়েবের গাড়ি। যা ভয় করেছিলুম তাই। আসাই মিথ্যে হল।

নৈরাশ্যবাদী রমেন এ কথায় একটুও দমল না। শুধু বলল, মিথ্যে হল কেন বলছ ?

আর কেন!—নন্দ জবাব দিল, আপনার বরাত ভাল নয়। আসুন এদিকে, এ বেটার সঙ্গে দেখা করে চলে যাই।

রমেন এগিয়ে এল নন্দর পিছু পিছু। সামনের রোয়াক পেরিয়ে দালানের পাশ দিয়ে ঢুকে একটি বড় ঘরের দরজার কাছে এসে ভিতরে তাকিয়ে বলল, এই যে, লালাজী—

ভিতর থেকে আওয়াজ এল, আরে এস ভাই নন্দ, বোস। উনি কে পিছনে তোমার?

রমেন এগিয়ে এসে লালাজীকে নমস্কার জানাল, এবং লালাজী সমাদরসহকারে বসবার জায়গা দেখিয়ে দিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখা গেল, তিন-চারখানা হল-ঘর নিয়ে মস্ত গদি। শুধু চাল-ডাল নয়, তিসি ভুষি সরসে কলাই—সব ঠাসা চারিদিকে। এ-ঘরটার এক পাশে হাতখানেক উঁচু মস্ত চৌকির ওপরে ফরাস পাতা, তিন-চারটে ছোট তাকিয়া ছড়ানো। মাথার দিকে পাশাপাশি দুটি সিঁদুর-মাখানো লোহার সিন্দুক। এ পাশের কুলুঙ্গিতে একটি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। দেয়ালে টাঙানো রবি বর্মার রঙিন ছবি 'শান্তনু ও গঙ্গা'। ওপাশে স্তূপাকার লাল-খেরোর-মলাট-দেওয়া লম্বা লম্বা খাতা। দুজন কেরানী তখনও সামনে দুটো বাক্স রেখে একমনে কাজ করছে। সমস্ত ঘরের দেওয়ালটা ফিকে সবুজ রঙের তেল পালিশ করা। মারোয়াড়ীর গদি।

নন্দ একখানা চিঠি বার করে দিল লালাজীর হাতে। সেটি পড়ে লালাজী একবার নন্দর মুখের দিকে তাকাল, এবং তখনই নন্দ তার কোমরের সঙ্গে জড়ানো একটি মোটা থলি বার করে লালাজীর দিকে এগিয়ে দিল। পরে বলল, সব গোনা আছে, তোমার ভয় নেই।

উভয়ের মধ্যে এমন একটা সম্পর্কের আন্দাজ করা যায়, যার মধ্যে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। এক সময় মুখ ফিরিয়ে লালাজী বলল, শুনছেন রোমেনবাবু, আপনার নসিব আজ ভাল নয়। দিদি-

সাহেবের মেজাজ খুস নেই। সায়েব থাকলে তো আরও খাপ্পা। তুমি ওঁকে উপরে লিয়ে যাও নন্দ।

আমি নিয়ে যাব ? তবে তোমার কাছে এলুম কেন ?

সমগ্র ব্যাপারটা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠবার আগে লালা লাতুরাম নিজেই উঠল। বলল, বাঃ, এ বেশ কোথা! হামি বললে কাজ কিছু হবে কি ? আচ্ছা, ভাই বসো, দেখি—

লাতুরাম ঘর থেকে বেরিয়ে বিপুলকায় কয়েকটি চটের বস্তার পাশ কাটিয়ে উপরের সিঁড়িতে উঠছিল, এমন সময় একজন কোট-প্যাণ্টপরা ভদ্রলোক উপর থেকে নেমে এলেন। আলোটা বেশ উজ্জ্বল। সাহেবটি যখন পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রমেনের চোখ পড়ল তাঁর দিকে পলকের জন্য। দেখে সে চমকে উঠল—উনিই তাদের ডিপার্টমেণ্টের সকলের বড় কর্মচারী। সম্প্রতি ওঁর বিরুদ্ধে নানা অপযশ রটেছে। কিন্তু নিরীহ রমেনের পক্ষে সে সব অপযশের আনুপূর্বিক ইতিহাস কিছুই জানা ছিল না।

একটু পরেই লাতুরাম নেমে এল। নন্দ এতক্ষণ একটু উৎসুক হয়ে বসে ছিল। সে প্রশ্ন করল, আম্যার কথা বল নি তো ?

লাতুরাম জবাব দিল, খবর দিয়ে এসেছি শুধু। তুমি ভয় পাও কেন নন্দ ? ভয় করতে নেই আওরৎকে। যান রোমেনবাবু, আপনি উপরে উঠে যান—সোজা চলে যান—

রমেন মনে মনে একবার তার বক্তব্যগুলি ভেঁজে নিল, তারপর চটের বস্তাগুলির পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। শেষের দিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জনৈক কৃষ্ণকায়া বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক। রমেন উঠে এসে সামনে দাঁড়াতেই সে বলল, আসুন—

এই বলে সে নিজেই এগিয়ে এসে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে রমেনকে নিয়ে একটি ঘরে ঢুকল। পরে বলল, আপনি বসুন, উনি গানের ঘরে আছেন, আমি খবর দিই।

স্ত্রীলোকটি চলে গেল। রমেনের পা দুটো একটু থরথর করছিল।

বাইরে আলো জ্বালা, সেজন্য এখান থেকেই দেখা যায় দোতলাটা মস্ত বড়, ঘর অনেকগুলি। সেই দিককারই কোন একখানা ঘর থেকে সেতার আর তম্বুরার আওয়াজ আসছে। আওয়াজ অস্পষ্ট এবং মিষ্ট—উগ্র নয়। এ ঘরে বোধ করি সহসা কেউ বসে না। নানাবিধ আসবাব এক পাশে জড়ো করা। পুরনো ধরনের কয়েকখানা ছবি দেওয়ালে ঝুলছে। কতকগুলো এলোমেলো বাক্স স্তূপাকার করা রয়েছে। এক পাশে কতকগুলো বাসন। মানুষের সাড়াশব্দ বিশেষ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির পাশে অপর একটি অল্পবয়স্কা মহিলা এসে দাঁড়ালেন। রমেন সবিনয় নমস্কার জানিয়ে চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে বড্ড অসময়ে বিরক্ত করতে এলুম।

মহিলার দিকে মুখ তুলে থাকাটা একটু অশোভন। তবে বুঝতে পারা যায় চেহারাটা সুশ্রী। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শ্রী। রমেনকে দেখেই মহিলা হঠাৎ একটু হাসল। হাসিমুখেই বলল, আমি মনে করেছিলুম অন্য কেউ, আপনি এসেছেন ঠিক বুঝতে পারি নি।

থতিয়ে গেল রমেন। সে তো কই এ মহিলাকে কখনও দেখে নি! ব্যাপারটা যেন স্পষ্ট তার বোধগম্য হল না। সেই জন্য সে সঠিক হবার চেষ্টা করে বলল, আপনিই কি শোভা দেবী? সামন্ত মশাই প্রায়ই আপনার নাম বলেন।

হ্যাঁ, আমিই। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। রাজু, ওঁকে চা এনে দাও। আর শোন, মেয়েদের বল আমার একটু দেরি হবে। ওরা যদি বসতে না পারে তা হলে আবার যেন বুধবারে আসে।

রাজু চলে গেল।

শোভা এসে কাছাকাছি চৌকির উপর বসল। তারপর হাতের মুঠো থেকে একখানা চিঠি বার করে বলল, গোলোক চিঠি দিয়েছে, কিন্তু আপনার নামটা লেখে নি। আপনি বোধ হয় খুব অবাক হয়ে গেছেন আমার কথায় ?

নতমুখে রমেন বলল, আপনি কী করে আমাকে চিনলেন ঠিক এখনও বুঝতে পারি নি।

হাসিমুখে শোভা বলল, বাঃ, কেন চিনব না ? আপনার ব্লক নম্বর দুই, আর রুম নম্বর এগারো। আজ দেড় বছর ধরেই তো আপনাকে দেখছি। আর আপনারা তো পুরুষমানুষ, আপনাদের চোখ থাকে শুধু চাকরির দিকে। আমার এখান আপনি কেমন করে চিনলেন ?

রমেন বলল, আমি একা আসি নি। কিন্তু—কিন্তু অনেক আশা করে এসেছি। আপনার দুটি মুখের কথায় আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। চাকরিটা যদি যায়, আমি আর কূলকিনারা পাব না। যদি দয়া করে—

শোভা বলল, এ চিঠি কি আপনি গোলোককে লিখতে বলেছেন ?

আজ্ঞে না, ও চিঠির কথা আমি কিছুই জানি নে।

ঈষৎ উগ্রকণ্ঠে শোভা বলল, কিছু মনে করবেন না, আমি আবার জিজ্ঞেস করি, আপনি কার সঙ্গে এসেছেন ?

রমেন বলল, গোলোকের শালা নন্দর সঙ্গে এসেছি।

ও, নন্দর সঙ্গে। তা হলে যা ভেবেছি তাই। আচ্ছা, আমি আপনার চাকরির সুপারিশ করতে পারি, এ কথা আপনাকে কে বললে ?

ওদের মুখেই শুনেছি। তবে এতে যদি আমাদের কারও অন্যায় হয়ে থাকে, আমাকে ক্ষমা করুন।

শোভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইল। পরে মুখ ফিরিয়ে বলল,

আপনি ভাল হয়ে বসুন রমেনবাবু। এখানে আড়ষ্ট হবার কিছু নেই। আপনাকে সব কথা বোধ হয় বলতে পারব না তবে এটুকু শুনে রাখুন, ওরা আপনাকে ভুল বুঝিয়েছে। ওরা কেউ আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না, বরং ফাঁদে ফেলারই চেষ্টা করছে।

কপাল মন্দ, রমেন আগেই জানত। আসাটা মিথ্যে হল, দুঃখ করার কিছুই নেই। সান্ত্বনার কথা এই, পকেট থেকে গাড়িভাড়াটা লাগল না। ব্যাপারটা নারীঘটিত বলেই প্রথম থেকে তার উৎসাহ ছিল না। এদের মধ্যে বোধ করি নানাবিধ চক্রান্তের কাহিনী আছে, সুতরাং এদের এই জটিলতার ভিতরে তার পক্ষে না আসাই সঙ্গত ছিল। তার চোখে সমস্তটাই যেন মুহূর্তে বিস্বাদে ভরে উঠল।

এবার আমি উঠি তা হলে।

উঠবেন? সে কী?—শোভা একটু ব্যস্ত হয়েই বলল, যে কাজে এলেন তার কথা তো কিচ্ছু হল না?

এবার রমেন একটু স্পষ্ট হল। বলল, কাজের কথা ওইটেই ছিল। ওদের কাছে শুনেছিলুম আপনার সুপারিশে কাজ হয়। এখন আমার ভুল বুঝতে পারলুম। এবার আমি চলি।

বসুন, ব্যস্ত হবেন না। আমি এখুনি আসছি।—বলতে বলতে শোভা নিজেই উঠে বাইরে গেল এবং কী একটা নাম ধরে কাকে যেন ডাকল।

রমেন আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। কে যেন সিঁড়ির দরজাটা আবার খুলল।

মিনিট দুই পরে নীচে শোভার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। অত্যন্ত উগ্রকণ্ঠে নন্দকে সে তিরস্কার করছে। সেই তিরস্কারের ভাষা এমনই কটু এবং কঠিন যে, সেটা স্বয়ং রমেনের পক্ষেও যথেষ্ট সম্ভ্রমসূচক মনে হল না। এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে।

কতক্ষণ পরে শোভা নিজেই উঠে এল এবং দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল। ঘরের মধ্যে সে যখন পুনরায় এসে দাঁড়াল, উত্তেজনায় তার মুখখানা টকটক করছিল। রমেন মাথা হেঁট করে বসে ছিল ঠিক সেইভাবে। শোভা বলল, ওই বাঁদরটার সঙ্গে আপনি খুব মেলামেশা করবেন না। ওকে আমার এখানে আসতে কতবার মানা করেছি, কথা শোনে নি।

ও কিন্তু আমারই কাজে এসেছিল।

হেসে উঠল শোভা: মনেও করবেন না। নিজের কাজ ছাড়া ওরা এক পা চলে না। আপনাকে আমার কাছে এনেছে কেন জানেন? আমার সঙ্গে দু-একজন অফিসারের বদনাম রটাতে পারলে আমাকে জব্দে রাখার সুবিধে হয়।

রমেন বলল, আপনাকে জব্দে রাখবে? কেন?

ওদের অনেক রকমের স্বার্থ রমেনবাবু। কিছুদিন থেকে ওরা আমার বিরুদ্ধে জঘন্য বদনাম রটাচ্ছে নানা লোককে দিয়ে। উদ্দেশ্য একটা আছে, আমি জানি।

মুখ তুলল রমেন।

শোভা বলল, শুনবেন? তা হলে ছোট্ট করে বলি, কিছু মনে করবেন না। আমি যদি বিপদে পড়ে নন্দর ঘরকন্নায় গিয়ে উঠি, গোলোক ভারি খুশী হয়। এবার বুঝতে পেরেছেন?

শোভা নিজেই হেসে উঠল। তারপর বলল, এই দেখুন না, বাঁদরটাকে তাড়িয়ে দিলুম তো, দেখবেন আবার কিছুদিন পরেই আসবে। লাভুরামকে নিয়ে ওরা দল ভারি করেছে।

আবার একটা অস্বস্তিতে রমেন উসখুস করে উঠল। নন্দ যদি চলে গিয়ে থাকে তা হলে তার গাড়িভাড়াটা দিচ্ছে কে? সুতরাং তখনই সে বলল, ওঁকে সরিয়ে দিলেন, কিন্তু ওরই সঙ্গে আমার ফেরবার কথা ছিল।

আপনি কেন ফিরতে যাবেন ওর সঙ্গে। ও যাকগে। তা ছাড়া আপনি আমার অতিথি। আপনাকে তো এভাবে ছেড়ে দিতে পারি নে।

এমন সময় রাজু এল জলখাবারের থালা আর চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে। শোভা সেগুলি নিজেই নিয়ে সযত্নে চৌকির উপর রাখল। তারপর হাসিমুখে বলল, ভারি মজা লাগছে আপনাকে দেখে। আপনি যেন মস্ত বিপদে পড়ে গেছেন।

এতক্ষণ পরে সবিনয়ে হেসে রমেন বলল, তা মিথ্যে বলেন নি।

হেসে উঠল শোভা। বলল, আমার মা কী বলতেন জানেন? মেয়েদের ভয় করলেই মেয়েরা ভয় দেখায়। ওরা হল শাঁকচুন্নির জাত। আপনি যতই ভয় পাবেন আমি ততই হাসব। রাজু, ওঁকে নিয়ে যাও, উনি মুখ হাত ধুয়ে আসবেন।

চাকাটা যেন কেমন করে ঘুরে গেল। রাজু এগিয়ে এসে বলল, আসুন আপনি—

রাত আটটা বেজে গেল, কিন্তু শোভা এমন ভাবেই তার গল্প আরম্ভ করেছিল যে, বিদায় নিতে আড়ষ্ট বোধ হচ্ছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা এই, দেড় বছরের মধ্যে রমেন একটিবারও এই মেয়েটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করে নি। অথচ গোলোক সামন্তর দোকান-বাড়িতে শোভাকে উপস্থিত থাকতে হয় সপ্তাহে অন্তত দু দিন—কারণ ওই দোকানের বারো আনার মালিক সে নিজে। ওখানে একটা হিসাবপত্রের ব্যাপার আছে, কথা কাটাকাটি আর বিলিব্যবস্থাপনার বিতর্ক আছে,—ওখানে গিয়ে না দাঁড়ালে তার চলে না। সে জানে রমেনের খাদ্যতালিকা, চাল-চলন, রমেনের প্রাত্যহিক গতিবিধি আর বাসাড়ে ঘরকন্না। রমেনের অনেক খবর সে রাখে।

রমেন এতক্ষণে অনেকটা সহজ হতে পেরেছিল। দ্বিধাসঙ্কোচ

কাটিয়ে এক সময় বলল, আশ্চর্য, আমি কোনদিন টের পাই নি, তা হলে আমি নিজেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতুম। এবার বলুন তো, এ ব্যাপারটা কী? সামন্ত এ কথা কেন বলে যে, আপনাকে ধরলে আমার চাকরি থাকবে?

শোভা বলল, এর কারণ আছে। আগেই ওদের শয়তানির কথা বলেছি। আসল কথাটা শুনুন এবার। মায়ের দরুন খানিকটে জমি আছে ওখানকার জঙ্গল ঘেঁষে, সেই জমিটুকু কেমন করে গ্রাস করবে, এজন্য জনকয়েক ঠিকাদার চেষ্টা করছে। তারাই লোক লাগিয়েছে। আমি জানি এর মধ্যে গোলোক আছে, বিরিজলাল তেওয়ারি আছে, অফিসার এঞ্জিনীয়ার আছেন তিন-চারজন। এমন কী আমার ওই ভাড়াটে লাছুরাম—ওরও নজর আছে এর মধ্যে। যত রকমে পারে আমাকে চাপ দিচ্ছে।

এসবই কি আপনার মায়ের ছিল?

হ্যাঁ, সবই তাঁর। তিনি নেই, আমি এখন আছি। বোধ হয় এ কথাটা আপনি শোনেন নি, মায়ের টাকাতেই গোলোকের ভাগ্য তৈরী হয়েছে। আর সেই টাকার লেখাপড়াটা যদি আপনি দেখেন, দেখবেন গোলোকের অধিকার কত সামান্য। আজ ওরা কজন মিলে চেষ্টা করছে যাতে আমার কলঙ্ক রটে।

রমেন এবার সাহস করে প্রশ্ন করল, তা হলে তখন যে সাহেবটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন তিনিও কি এদেরই দলে?

ঠিক ধরেছেন।—শোভা বলল, এই চাকাতে উনিও কোমর বেঁধে ঘুরছেন। উনি আপনাদেরই আপিসের কর্তা, হুঁশিয়ার লোক। জমিটার সম্বন্ধে পাকা কথা নেবার জন্য উনি মাঝে মাঝে এসে ধরনা দিচ্ছেন। আজ বিকেল থেকে এসে ঠায় বসেছিলেন। কিছু একটা পরামর্শ আপনি দিতে পারেন, আমার কী করা উচিত?

বাঃ, এ বেশ কথা!—রমেন হাসিমুখে বলল, আমি এলুম আপনার সাহায্য চাইতে, আর আপনি চাচ্ছেন আমার পরামর্শ? আপনার গল্প শুনে ভয় হচ্ছে, কেমন করে একা চারদিক আপনি সামলাবেন!

শোভা বলল, যদি দরকার হয় আপনার কাছে কোন সময়ে সাহায্য চাইলে পাব?

রমেন একটু মলিন হাসি হাসল। বলল, আমার চাকরি এই কটা দিন আর আছে। এর পরে আমাকে কোথায় চলে যেতে হবে, কে জানে! তখন তো দেখাই হবে না। সাহায্য কেমন করে করব?

শোভা কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করে রইল। পরে যখন মুখ তুলল, সে মুখে বিষাদের ছায়া পড়েছে। মৃত্নকণ্ঠে সে বলল, সে কথা ঠিক, কিন্তু এ চাকরিতে আপনার ভবিষ্যৎ কিছু নেই তো। এর চেয়ে অন্য কাজ কিছু করুন না।

রমেন বলল, হ্যাঁ, সে-কথাও সামন্ত মশাই আমাকে বলেছেন। উনি ওঁর তুখানা দোকানের সমস্ত হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদির কাজ আমাকে দিতে চান।

শোভা একটু চমকে উঠল। বলল, সামন্ত বলেছে এ কথা? এর মানে কী জানেন?

রমেন মুখ তুলে তাকাল। শোভা পুনরায় বলল, লোকটা এবার তার সমস্ত জালিয়াতি-হিসেব খাতায় তুলতে চায়। ভবিষ্যতে যদি মামলা বাধে, ওই খাতাপত্র পেশ করে দেখাবে যে, তার সমস্ত কারবার লোকসানের ওপর দাঁড়িয়ে। ওকে সব তুর্বুদ্ধি জুগিয়েছে এই লাতুরাম। আমি বলে রাখলুম, আপনাকে দিয়ে সমস্ত নোংরা কাজ করিয়ে নেবে গোলোক। আপনি কি রাজী হয়েছেন?

এসব জানবার পরেও কি রাজী হব?

কিন্তু সামন্ত যদি বুঝতে পেরে থাকে যে, বেশী মাইনে পেলে এ কাজে আপনি রাজী হবেন ?

রমেন বলল, বেশ, আমাকে বলুন, আপনার কাছে বিশ্বাস রাখার জন্য আমাকে কী করতে হবে ? তাই আমি করব।

শোভা আবার কিয়ৎক্ষণ চুপ করে গেল। এক সময় সে মুখ ফিরিয়ে বলল, না রমেনবাবু, আমার কাছে আপনার বিশ্বাসী হয়ে দরকার নেই। তবে কী জানেন, টাকার জন্যে আপনাকে অসাধুতার পথ ধরতে হবে, এ বড় অপমানের কথা। আপনি যদি মনে করেন একজন নিরুপায় মেয়েছেলেকে এভাবে প্রতারণা করা উচিত নয়, তখনই আপনার কর্তব্য আপনি বুঝবেন। শুধু এইটুকু আপনি জেনে রাখুন, কতকগুলো লোক চারিদিক থেকে আমাকে পথে বসাবার চেষ্টা করছে।

রমেন প্রশ্ন করল, তাদের এত রাগ কেন আপনার ওপর ?

রাগ নয়—শোভা বলল, লোভ। একজন অল্পবয়সী মেয়ে হঠাৎ কতকগুলো বিষয়সম্পত্তির মালিক হল, এটা ওদের বরদাস্ত হচ্ছে না। মা বেঁচে থাকতে এসব কথা ওঠে নি। ওই লাভুরাম ছিল মাটির মানুষ, ওই গোলোক ছিল বারো টাকা মাইনের গোমস্তা, নন্দ আমাদের ফাইফরমাশ খাটত, জমিতে গিয়ে মজুর খাটাত—

আপনার বাবার কথা তো বলছেন না ?

না, বাবাকে আমি দেখি নি। তাঁরা ছিলেন এদিককার বিখ্যাত মুখুজ্জে-পরিবার—। বাবা আলাদা থাকতেন মাকে নিয়ে। আমি মায়ের হাতেই মানুষ। তিনি আমাকে ইস্কুলেও পড়িয়েছেন, বর্ধমানের কলেজ থেকে দু-একটা পাসও করিয়েছিলেন। হঠাৎ মা মারা যাবার পর থেকেই বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে।

রমেন বলল, আচ্ছা, নন্দ কি আপনাকে সত্যিই বিয়ে করতে চেয়েছিল ?

হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে শোভা হেসে উঠল। অতি কৌতুকের হাসি। তারপর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে সেই উচ্ছল হাসি চেপে সে বলল, নন্দর আগে নন্দর দিদি চেয়েছিল আমাকে সতীন করে ঘরে তুলতে। কিন্তু সুবিধে হল না। তারপর ওর ভগ্নিপতি দিলে আমার পেছনে বাঁদরটাকে লেলিয়ে। শেষকালে আমাকে জব্দ করার জন্যে লাহুরাম আর গোলোক টাকা দেওয়া বন্ধ করল। আমি তখন এক সিন্ধী ঠিকেদারের কাছ থেকে টাকা ধার করলুম। সে লোকটার মতলব ছিল অন্য রকম। সুতরাং প্রথম তারই সঙ্গে মোকদ্দমা আরম্ভ হল।

একটি মেয়ের জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র বটে। সমস্ত ব্যাপারটা সংক্ষেপে রমেন অবশ্য শুনে যাচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে মস্ত কাহিনী জড়ানো, এটি অনুমান করতে তার বিলম্ব হয় না।

রমেন এবার উঠি-উঠি করছিল, এমন সময় রাজু এসে বলল, রান্না হয়ে গেছে দিদি।

উঠে দাঁড়াল রমেন। বলল, এবার তবে আমি যাই।

শোভা বলল, যাবেন তো নিশ্চয়ই, তাই বলে আমাদের রান্নাটা নষ্ট করে যাবেন ?

রান্না ! আমি যে খেলুম একটু আগে !

ওকে খাওয়া বলে না—চলুন। ঘণ্টা খানেক পরেই একখানা গাড়ি আছে তাতেই ফিরবেন। রাজু, তুমি ওঁকে খেতে দাও।

কোনও প্রতিবাদই রমেনের মুখে এল না। শোভা এগিয়ে চলল, এবং রমেন চলল তার পিছু পিছু। খাবার ঘরে এসে এক সময় শোভা সকৌতুকে বলল, আশ্চর্য মানুষ আপনি, চাকরি ছাড়া কোনদিকে আপনার চোখ নেই! দেড় বছরে এতবার আমি আপনাকে দেখলুম, আর আপনি একবার মুখ তুলে ফিরেও দেখলেন না ? আমি জানি, এ বাড়ি থেকে বেরোতে পারলেই আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। রাজু, ফটিক কোথা গেল, ওকে বল একখানা

রিক্শা এনে রাখতে। একেবারে টিকিট করে ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবে। আসুন, আমরা একসঙ্গেই খেতে বসি।

খাবারগুলি একে একে সাজিয়ে দিয়ে রাজু বাইরে গেল।

দুই

ভোরবেলা হঠাৎ সুখের নিদ্রা ভাঙল নিজের নড়বড়ে চৌকিখানার উপর। বাইরে থেকে কে যেন দরজা ঠেলছিল।

দরজা খুলতেই গোলোক সামন্ত একেবারে মুখোমুখি। হাসিমুখে রমেন বলল, ও, তুমি! এত সকালে যে?

গোলোক বলল, আমি ভাবলুম রাত্রে তুমি বুঝি ওখানে আটকেই গেলে। তাই দেখতে এলুম। খাওয়াদাওয়া বুঝি ওখানেই হল?

সত্য বলতে কোথায় যেন সহসা বাধল। রমেন বলল, না, খাওয়া আবার কিসের? কাজের জন্যে গেছি, কাজটাই আসল কথা।

বটেই তো, একশোবার। তবে ঠাকরুন আবার একটু অন্য রকমের মেয়ে কিনা! মনের মতন গল্পের লোক পেলে আর ছাড়তেই চায় না।—গলা নামিয়ে গোলোক বললে, তা হবে না কেন বল, বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেল যে! যাকগে—আমি ভাবলুম, নন্দ ছোঁড়া ফিরে এল থোঁতা মুখ ভোঁতা করে, তোমাকে বুঝি আজকের মতন আটকেই রেখে দিলে। তারপর কাজের কথা কিছু হল?

সামান্যই।—রমেন জবাব দিল।

সামান্যই? সে কী কথা? তিন-চার ঘণ্টা রইলে ওখানে। লাতুরাম তোমাকে তুলে দিয়ে এল। তুমি যেন কী চেপে যাচ্ছ ভাই রমেনবাবু।

রমেন হেসে উঠল। তারপর বলল, বেশ যা হোক, আমাকে

আবার সন্দেহও করা চাই। লাছুরাম তুলে দিয়ে এল, তারপর একখানা ঘরে গিয়ে বসলুম। অপেক্ষা করতে করতে ঘুম পেয়ে গেল,—ঝাড়া দু ঘণ্টা। ও মহলে তখন নাকি গানের ক্লাস হচ্ছে। এমন জানলে আমি যেতুম না সামন্ত মশাই।

সামন্ত গম্ভীরভাবে নিজের মনেই বলল, ও ছোঁড়াটা ফিরে এসে তা হলে এলোমেলো কী যেন আমায় বললে !—তারপর ?

রমেন বলল, তারপর আর কী। ঠাকরুন এসে পাঁচ মিনিট দাঁড়ালেন দরজার পাশে। বললেন, আমার দ্বারায় বিশেষ কিছু হবে না। আপনি বরং গোলোক সামন্ত মশাইয়ের কাছে যান, উনিই হলেন আমার অভিভাবক। যদি কিছু করা যায় উনিই করবেন। অত বড় কারবারের মালিক উনি।

গোলোকের মুখখানা দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, বলেছে এসব কথা ? মাইরি বলছ ?

প্রবীণ লোকটার পুলকিত মুখখানায় হাসি ঝলমল করতে লাগল। রমেন বলল, আরে, এটা বুঝতে পারছ না, তোমার সুবাদেই তো গিয়েছি। তোমার আলোচনাই তো হচ্ছিল।

হ্যাঁ, তা যা বলেছ। আমাকে মান্য করে খুব। হবে না, বড় বংশের রক্ত আছে যে শরীরে।—অসীম পরিতৃপ্তির কণ্ঠে গোলোক বলল, এই যে 'সামন্ত' বলে দেশসুদ্ধ লোক আমাকে জানে, এ নামটি ঠাকরুনের মায়েরই দেওয়া। হাত পা নেড়ে হৈ-চৈ করে কথা বলতুম, তাই গিন্নীমা নাম দিলেন, সামন্ত। নইলে আমরা হলুম বর্ধমানের সেই আদি রাম সরকারের গুষ্ঠি।

তোমাকে বোধ হয় খুব ভালবাসতেন তিনি ?

হ্যাঁ, একেবারে ছেলের মতন। তাঁর জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি ভাই। অসময়ে তাঁরই সাহায্য পেয়েছিলুম।

রমেন বলল, টাকাকড়ি দিয়েছিলেন বুঝি ?

গোলোক বলল, সেই তো কথা, টাকার মালিক হলে তবেই না মেজাজ উঁচু হয়। একালে দান-খয়রাতের লোকরা সব মরে-হেজেই গেল। তবে কী জান রমেনবাবু, মেয়ে ঠিক অতটা হয় নি। মায়ের মেজাজ ছিল অনেক বড়, মেয়ে তেমন নয়—এই দুঃখ। যাকগে, তোমার কাজ তা হলে হল না বলছ?

কই, না। কোথায় আর হল!

কাল খেলে কোথায়?

ইস্টিশানেই যা হোক সেরে নিলুম আর কী।

যাবার সময় গোলোক বলল, তাই তো, তুমি দেখছি বেশ ভাবিয়ে তুললে। তবে হ্যাঁ, আমার কাজটা যদি ধর তা হলে যা হোক করে তোমার চলেই যাবে। সরকারী কাজ নয় বটে, তবে টাকায় তুমি ঠকবে না, কথা দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন আমি চললুম। খাবার সময় হয়তো আবার দেখা হবে।

দু পা গিয়ে গোলোক আবার ফিরে এল। বলল, নন্দ ছোঁড়াটাকে কাল আবার 'বাঁদর' বলে তাড়া করেছিল শুনলুম। ছোঁড়াটা মুখ ফসকে বুঝি কী দু-একটা রসের কথা বলতে গিয়েছিল বছর দুই আগে, সেই থেকে ঠাকরুন ওকে ছাঁচে উঠতে দেয় না। মেয়ে ভারি মজবুদ, ঠাট্টা-তামাশার ধার মাড়ায় না। ভারি হিসেবী মেয়ে।

গোলোক হন হন করে চলে গেল। রমেন হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটা কোনও কথাই স্বীকার করল না, কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না।

হাসিমুখে রমেন আবার ভিতরে ঢুকে তার দরিদ্র বিছানাটা গুছিয়ে রাখতে লাগল বটে; কিন্তু গত রাত্রির অভিজ্ঞতা মনে করে একটা অস্বস্তিবোধ হতে লাগল এই, সে যেন একটা বিশেষ পাকে জড়িয়ে যাচ্ছে। গতকাল তার মনে যে নৈরাশ্যবাদ ছিল, আজ তার পরিমাণ কম। উৎসাহজনক কিছু তার চোখের সামনে অবশ্য নেই,

কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎটাও খুব নিরুৎসাহকর মনে হচ্ছে না। নিজেকে তার মূল্যবান মনে হচ্ছিল। কোথায় যেন একটি মিষ্ট সুর লেগেছে, একটা বিশেষ তার ঝঙ্কৃত হচ্ছে,—এটা রমেনের অহেতুক কল্পনা নয়। সে একা ছিল এতদিন, এখন পেয়ে গেল একটা ভাবনার আশ্রয়—এ চিন্তাটা কোথায় যেন তাকে শক্তি যোগাচ্ছে। গত রাত্রে রিক্‌শা করে সে যে-পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথের দুই পাশে একটা ছায়াচ্ছন্ন কাব্য যেন ঠিক মৌমাছির মত গুন গুন করে ফিরেছে। স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠেছে, ট্রেন থেকে নেমে ঘরে এসে শুয়েছে—কিচ্ছু মনে নেই। ঘরে সে তালা দিয়ে যায় নি, উদ্বেগও ছিল না সেজন্য। ঘুমের আগে এই অতি দরিদ্র ঘরখানার বোবা অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে সে যেন অনুভব করতে পারছিল, সে-বাড়ির সেই সেতার আর তম্বুরার মৃদু মধুর ঝঙ্কারটি তার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর এসে যেন তার প্রাণের ভিতরে উদ্বোধনী সঙ্গীতের আবেশ সৃষ্টি করেছে। তার ঘুমের মধ্যে সুখের মধুর অস্বস্তি অথবা নিবিড় বেদনার রোমাঞ্চ পুলক—কোন্‌টা সঠিক কাজ করে গেছে, এ কথা আজ সকালে তার মনে নেই। গিয়েছিল সে চাকরিটি কায়েমী করার আশায়, অর্থাৎ সম্পদ-লাভের কামনায়, কিন্তু তা হয় নি। ফিরে এসেছে ঐশ্বর্য নিয়ে,—স্থূল চেহারা যার কিছু নেই, কিন্তু মূল্য তার অনেক। আজ সকালে নিজেকে অতটা যেন আর গরিব মনে হচ্ছে না।

আপিস যাবার তাড়া আছে বইকি, এবং এখনই চা খাবার প্রয়োজন আছে। মুখ ধুয়ে জামাটা গায়ে চড়িয়ে সে গিয়ে হাজির হল ক্যান্টিনে; বসল গিয়ে এক কোণে। কেউ তাকে না দেখলে ভাল হয়, কথা কারও সঙ্গে না বলে নিজের মনে সময় কাটাতে পারলে আরও ভাল হয়। সত্য বলতে কী, মেয়ে সম্বন্ধে তার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। তার এই সাতাশ বছর বয়সের মধ্যে কোনও মেয়ের ফরমাশ আসে নি তার জীবনে। কেউ ডেকে বলে নি—তুমি অন্তরঙ্গ,

কেউ সাহায্য পাবার জন্য হাত বাড়ায় নি, কেউ বলে নি—পাশে এসে দাঁড়াও, মধ্যরাত্রে বিদায় দিতে গিয়ে কারও ছুটি আয়ত ও সংযত চোখ টসটস করে ওঠে নি। এ অভিজ্ঞতা তার অভিনব,—কোনও মেয়ে যদি বলে, দেড় বছর ধরে তোমাকে দেখে এসেছি, কিন্তু তুমি মুখ তুলে একটিবারও লক্ষ্য কর নি। সন্দেহ নেই, আজ চোখের সামনে থেকে যেন একটা আবরণ সরে গেল। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে সে একবার চুমুক দিল বটে, কিন্তু গলার ভিতর থেকে একটা পিণ্ড যেন তার উঠে আসতে চাইছিল। সেটা কী বলা কঠিন, বোধ করি একটা আর্তস্বর। জননীর গর্ভের অন্ধকার থেকে ভূমিষ্ঠ সন্তান যেমন বাহির বিশ্বের প্রথম আলো দেখে ককিয়ে উঠতে চায়, এও যেন তাই।

চায়ের দাম চুকিয়ে রমেন বেরিয়ে এল।

দিন তিনেক বাদে আপিস থেকে ফিরে রমেন সবেমাত্র একটু থিতিয়ে বসেছে, এমন সময় বাইরে কয়েকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। সম্প্রতি এদিককার কাজ অনেক কমে এসেছে এজন্য অনেকেই বদলি হয়ে যাচ্ছে এবং আরও অনেককে খারিজ করা হচ্ছে। কোয়ার্টারগুলি একে একে খালি হয়ে আসছিল। নতুন আর-একটা কারখানা বসাবার তোড়জোড় চলছে।

গলার আওয়াজ নিকটতর হয়ে আসছে লক্ষ্য করে রমেন একবারটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। ভুল হয় নি তার, সামন্তই হাত নেড়ে কথাবার্তা বলছিল। সঙ্গে রয়েছে শোভা আর ফটিক। নন্দ আসছে সকলের পিছনে হাতে একটা ঝোলা নিয়ে।

রমেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল। সে একটু আড়ষ্ট হল, তার সেই অপলাপবৃত্তি গোলোকের কাছে ধরা পড়েছে কি না সেই আশঙ্কায়।

শোভা এগিয়ে এসে হাসল। বলল, সন্নিসি-ফকিরের ঘরখানা একবার স্বচক্ষে দেখতে এলুম। ফটিক, খাবার জল একটু দে তো ঘর থেকে। গেরস্থালি বুঝি কিছুই নেই?

ফটিক ভিতরে আসছিল, রমেন বলল, না না, থাক্—আমিই এনে দিচ্ছি।

তা হলে থাক্, আমিই নিচ্ছি।—বলেই শোভা এসে ঘরে ঢুকল। বলল, সরুন, পুরুষ মানুষকে ফরমাশ করব, এখনও এত স্বাধীন হই নি।

রমেন হাসিমুখে বলল, ফটিকও তো পুরুষ মানুষ।

নতুন কলাইয়ের গ্লাসে আলগোছে জল খেয়ে খুশী হয়ে শোভা বলল, ফটিক মানুষ কি না জানি নে, তবে পুরুষ নয়।

কথাটা ধারালো। সপ্রতিভ রমেনের মুখে কোন কথাই জোগাল না। শোভা বলল, কই দেখি, সরুন, আপনি একেবারেই বাসাড়ে। একটু গোছগাছ দেখছি কোথাও নেই। শতরঞ্চিখানা একদম ছেঁড়া। সরকারী চাকরি করছেন, নিজের জন্য একখানা শতরঞ্চিও কিনতে পারেন না।

শোভা সেখানা তক্তার ওপর থেকে তুলে নিয়ে বাইরে এসে নিজের হাতেই বারান্দায় পাতল। পরে বলল, বসুন আপনি মাঝখানে, আমাদের ঝগড়া মেটান, দেখি আপনার ক্ষমতা।

নন্দ এগিয়ে এসে তার ঝোলাটা সামনে নামিয়ে রাখল। তারপর বলল, আমাকে আর-কিছু দরকার আছে? থাকব এখানে?

মুখ তুলে শোভা বলল, তোকে আবার কী দরকার, তুই যা। সামন্ত, বোস এখানে।

নন্দ কাঁচুমাচু করে সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেল। রমেন একটু সহানুভূতির সঙ্গেই তার দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, এই যে, বসি। আর, আমি কি একাসনে বসবার যুগ্যি?

—বলতে বলতে সামন্ত শতরঞ্চির কোণটি একটু সরিয়ে শান-বাঁধানো মেঝের উপরেই বসল। পুরনো গোমস্তা সে।

ঝোলাটার গেরো শোভা নিজের হাতেই খুলল। কতকগুলি কাচের প্লেট, গেলাস, চামচ, গরম চা ভরা কেট্‌লি, চপ এবং ডিমের খাবার, রুটি, মাখন এবং মিষ্টান্ন। গেলাস চারটে এগিয়ে দিয়ে শোভা বলল, ফটিক, ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয় তো।

গোলোক বলল, দোকানে ছুটে যা ফটিক—ছটুকে বল্ জগে করে ভাল জল যেন তুলে দেয়।

যে আজ্ঞে।—ফটিক হন হন করে চলে গেল।

শোভা বলল, ভয় নেই, খাইয়েদাইয়ে আপনার এখানে বিল পাঠাব না। কিন্তু এ হল চারজনের খাবার,—আপনার একলার নয়।

গোলোক একেবারে প্রাণের আনন্দে উচ্চ হাসি হাসতে লাগল। বলল, ঠাকরুন আমাদের এদিককার ডাকসাইটে মেয়ে, বুঝলে রমেনবাবু? কথায় পারবার জো নেই। হবে না! কেমন মায়ের মেয়ে! সবই তো আমার মনে আছে। কদিনেরই বা কথা!

রমেন এতক্ষণ পরে একটু সহজ হল। বলল, চারজন কেন বলছেন, এতে আটজনেরও পেট ভরে।

স্বাস্থ্যশ্রী আর লাবণ্যে শোভা যেন ঝলমল করছিল। সাজসজ্জায় কিন্তু তার বিলাস নেই, সাদামাটা একখানা শাড়ি এবং রেশমী চাদর গায়ে জড়িয়ে সে চলে এসেছে। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে এক-একগাছি মিহি সোনার চুড়ি, গলায় তারও চেয়ে সরু একটি হার দেখা যায়, কানে ছোট্ট দুটি ফুল।

প্লেটে করে খাবার এগিয়ে দিল শোভা সামন্তর দিকে। অন্য প্লেট রাখল ফটিকের জন্য। তারপর রমেনকে বলল, বসুন, সেই তো সকালে খেয়ে কারখানায় ঢুকেছিলেন। টিফিন খান কিছু? নিন বসুন, লজ্জা করবেন না।

রমেন, শোভা, সামন্ত—সবাই বসে গেল। শোভা বলল, ফটিককে নিয়ে আমি সেই বেরিয়েছি বেলা এগারোটায়। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, মেয়েছেলের ক্ষিধে যেন কখনও না পায়।

সামন্ত এবং রমেন দুজনেই হেসে উঠল। তারপর আহারাদির মাঝখানে সামন্ত বলল, ঠাকরুন কিন্তু কথাটায় আমাকেই ঘা দিল, বুঝলে রমেনবাবু? কত সাধাসাধি করে বললুম যে, রাগারাগি থাক্‌, আগে দুটি খেয়ে নাও। কথাটা কানেই তুলল না।

রমেন বলল, কেন, রাগারাগি কিসের?

রাগারাগি!—সামন্ত মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে বলল, কারবারে যে আমার লোকসান যাচ্ছে, ঠাকরুন তা বিশ্বাস করে না।

সে কি, লোকসান গেলে কারবার কেমন করে চলবে?

সামন্ত বলল, এমনি করেই চলছে এতদিন। ঠাট বজায় না রাখলে দু বেলা দু মুঠো ভাত জুটবে কেমন করে বাবু? দু খানা দোকানে চোদ্দ-পনেরো জন লোক খাটছে, কারবার বন্ধ করলে তারাও পথে বসবে।

কথাটা মিথ্যে নয়।—রমেন বলল।

চামচ দিয়ে একটু খাবার মুখে তুলে শোভা বলল, এসব কথা তুলতে আমার বড্ড ঘেন্না করে, তা জান সামন্ত? কারবারটা যে তোমার একেবারেই নয়, এ কথাটা বলছ না কেন? হিসেবের কথা তুললেই লোকসানের কথাটা উঠবে, এও তো ভাল নয়।

গোলকের আসল জায়গাটায় এবার ঘা পড়েছিল। সে বলল, কারবারটা তো আমিই গড়ে তুলেছি ঠাকরুন।

শান্ত হাস্য করে শোভা বলল, তোমারই তো গড়বার কথা ছিল। চার আনার ভাগ তোমাকে দেওয়া হয়েছিল গড়ে তোলবারই জন্যে। আমি তো তোমাকে সরাতে চাচ্ছি নে, হিসেব চাচ্ছি।

গোলক বলল, হিসেব হল একটা বুজরুকি, কাগজপত্রে ফাঁকি

আর ফাঁকগুলো ভরিয়ে রাখা। ছুনিয়ার কোনও হিসেবই সত্যি নয় ঠাকরুন। বড় বড় ব্যবসা হল বড় বড় জোচ্চুরি। ওসব গভীর জলে রুই-কাৎলারা লুকিয়ে থাকে। হিসেবপত্তর রেখে তোমার কাছে আমি সাধু সাজতে চাই নি ঠাকরুন।

শোভা একবার রমেনের দিকে তাকাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, এসব কথা বললে তোমার বিপদ ঘটবে সামন্ত। তুমি কারবার করছ, কিন্তু হিসেব রাখ নি—বিশ্বাস করবে কেউ?

শোন, ঠাকরুনের কথা শোন বাবু।—গোলক বলল, আমি ছিলুম তোমাদের ঘরের গোমস্তা, তোমাদের খেয়ে মানুষ। মামলা-মোকদ্দমা তোমাদের কাছেই শেখা। আমার বিপদ হল আদালত, এই তো! ঝগড়া মিটে যায় একদিনে ছুই পক্ষ রাজী হলে, কিন্তু আদালতে গিয়ে ঝগড়া মেটাতে চাইলে পাঁচ বছরের আগে মিটবে কি? রমেনবাবু, তুমি কী বল?

রমেন বলল, এসব নিজেদের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাওয়াই ভাল, সামন্ত মশাই।

ফটিক ছুটতে ছুটতে খাবার জল নিয়ে এল। সেই জল খেয়ে এবং তাইতে হাত ধুয়ে শোভা বলল, মিটমাট বোধহয় হবে না সামন্ত। মামলা বাধলে এ কথা উঠবে যে, বর্ধমান শহরে তুমি বউয়ের নামে বাড়ি কিনেছ, নন্দর নামে ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছ, জামাইকে দিয়ে ধানী জমি কিনিয়েছ। কিন্তু গোড়ায় সমস্ত টাকাই আমার মায়ের। দলিলকে নাকচ কোর না, সামন্ত।

সামন্ত এবার শান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি যদি দলিল বার কর ঠাকরুন, তা হলে আমাকেও রঙের গোলাম হাজির করতে হবে। মুখুজ্জে-বংশের সঙ্গে তোমাদের ছোঁওয়াচের কথাটা তুলতে হবে বই কি। তুমি তো আর ছেলেমানুষটি নও ঠাকরুন, বাইশ পেরিয়ে তেইশ বছরে পা দিয়েছ। জ্ঞানগম্যি হয়েছে বইকি।

রমেন স্তব্ধচক্ষে সামন্তর দৃঢ় মৃদু কণ্ঠের কথাটা কানে তুলে নিল। এর পিছনে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুর্নীতির ইঙ্গিত রয়েছে, এবং তারই আভাস দিয়ে বিষধর সাপ যেন এবার জেগে উঠে তার ফণাটা একবার নাড়ল।

যে উগ্রতা শোভার কণ্ঠে এতক্ষণ অবধি পাওয়া যাচ্ছিল সেটা যেন সামন্তর ফুৎকারে দপ করে নিবে গেল। এটা তার প্রত্যাশার অতীত ছিল। তার সমস্ত উত্তেজনা এবং তেজস্বিতার চেহারা যেন বিশেষ যাদুস্পর্শে সহসা আপন শক্তি হারিয়ে কেমন একটা পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে এল। সামন্তর মুখের দিকে সে যখন মুখ ফিরিয়ে তাকাল, সে মুখ পাণ্ডুর এবং অসহায়। বোধ হয় পলকের মধ্যে রমেন বুঝতে পেরেছিল তার নিরুপায় অবস্থাটা, সেই জন্য চট করে সে বলল, আপনার চা কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে।

শোভা মুখ ফেরাল। বলল, ফটিক, চা ঢেলে দে তো। হ্যাঁ, তা হলে কি এই কথাই বুঝে নেব সামন্ত যে, তুমি আমার পাওনাও বুঝিয়ে দেবে না আর লাদুরামের ব্যাপারটারও নিষ্পত্তি করবে না ?

সামন্ত বলল, লাদুরাম আমার কথা শুনবে কেন ?

সে তো ভাড়া দেওয়া বন্ধ করেছে তোমারই কথায়। দলিল তো তোমারই কাছে।

সামন্ত বলল, তোমার মাথা ঠাণ্ডা না হলে কোনও ব্যবস্থাই তোমার দ্বারা হবে না ঠাকরুন। আমার কথা যদি বল, আমি সব সময় মিটমাট করতে প্রস্তুত। তুমি নরম হলে সব ব্যাপারই কিন্তু একদিনে মিটে যায়। লাদুরাম ও-বাড়ি ছাড়বে না, ওর বেশী ভাড়াও দেবে না। তবে তুমি যদি রাজী থাক, বাড়িখানা ও কিনতে পারে।

শোভা বলল, বাড়ির দাম কে ঠিক করে দিচ্ছে ?

সামন্ত এবার হেসে উঠল। বলল, বুঝলে রমেনবাবু, সব সময়

ঠাকরুনের ধারণা, আমরা সবাই মিলে ওকে ঠকাচ্ছি। ওই যাকে বলে, সন্দেহ বাতিক।

পাছে শোভা রেগে ওঠে, এজন্য রমেন বলল, এর কারণ আছে সামন্ত মশাই—উনি যে একলা।

ওই জন্যেই তো বললুম, নন্দ কাছে থাক্—সেই হল ভরসা।

ক্রুদ্ধ বাঁকা চোখে চেয়ে শোভা বলল, ফটিক তো আছে, নন্দকে তুমি কেন পাঠাও আমার ওখানে ?

ওই শোন—সামন্ত বলল, একবার বেঁকলে কার বাবার সাধ্যি সোজা করে! ফটিক আর নন্দ এক হল ?

না, এক হবে কেন ? ফটিক হল মানুষ, আর ওটা বাঁদর। তুমি যদি আসল কাজের কথা নিষ্পত্তি না কর, তা হলে চল আমরা রমেনবাবুকে ছেড়ে দিয়ে যাই। মিথ্যে ওঁর সময় নষ্ট করব না।

সামন্ত বলল, না, আমার আর বলবার কিছু নেই। তুমি যেমন ভাল বুঝবে তেমনি করবে। আমি এখন চললুম, যাবার সময় তুমি টাকা নিয়ে যেয়ো। হ্যাঁ, একটা কথা, রমেনবাবুর কাজ থাকবে কি না আমি জানি নে। যদি না থাকে তবে হোটেলের খাতাপত্তর রাখার কাজটা উনি নিতে পারেন, তুমি যদি রাজী থাক।

শোভা বলল, উনি কেন আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাবেন ?

রমেন বলল, বোধ হয় আমার পক্ষে সুবিধেও হবে না। তা ছাড়া আমাকে হয়তো চলেও যেতে হবে।

সামন্ত এদিক ওদিক চেয়ে বলল, সন্ধ্যের আলো জ্বলল। আমি এখন চললুম—ওরা বসে আছে, আমি গেলে তবে এ বেলা হোটেলের রান্না চড়বে।

সামন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হল। ফটিক এগিয়ে এসে বাসনগুলি একত্র করে তেমনই আবার ঝোলাটায় ভর্তি করে বলল, এগুলো আমি ততক্ষণ ধুয়ে রেখে আসি। আপনি কি একটু বসবেন ছোটমা ?

শোভা বলল, গাড়ি কটায় ?

ছটার গাড়ি তো পাব না, আবার সেই সাড়ে আটটায়। আমি ওখানে অপেক্ষা করব।—ঝোলাটা গুছিয়ে নিয়ে ফটিক হেটেলের দিকে এগিয়ে চলল।

এদিকে ওদিকে লোকজন আনাগোনা করছিল বটে, তবে এই অঞ্চলটা অনেকটা নিরিবিলি। শোভা এবার হাসিমুখে বলল, আমরা না এলে বোধ হয় আপনি বেড়াতে বেরুতেন এতক্ষণ ?

রমেন বলল, হ্যাঁ, তা ঘণ্টা দুই অবশ্যি রোজ ঘুরে আসি বটে। বাঁধের দিকটা বেশ ফাঁকা জায়গা, ওদিকটাই ভাল লাগে। তবে না গিয়ে লোকসান হয় নি আজ।

আমরা ত ঝগড়া করছিলুম, আপনি কি ভাবছিলেন এতক্ষণ ?

রমেন হাসল। বলল, সহজ কথাটাই এতক্ষণ মনে হচ্ছিল। মেয়েছেলের হাতে বিষয়-সম্পত্তি থাকলে হাঙ্গর-কুমীররা আশপাশে চলে ফিরে বেড়ায়।

আপনার কি মনে হচ্ছে আমি সামলাতে পারব না ?

রমেন বলল, না, আপনি পারবেন না। ওদের সঙ্গে আপনি পেরে উঠবেন না। ওরা সব একজোট।

শোভা বলল, আমার কি করা উচিত বলুন তো ?

রমেন আবার হাসল। বলল, যে-ব্যক্তির চালচুলো কিছু নেই, তার পরামর্শ আপনার কাজে লাগবে কেন ? তাছাড়া, আমি আজ আছি কাল নেই। চাকরি ত এখন 'পদ্মপত্রে নীর'।

শোভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটু নতমুখেই বলল, আজকে আমিই আপনার এখানে সামন্তকে ধরে এনেছিলুম। সেদিন রাত্রে আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল—মানে, ভরসা হয়েছিল, আপনার কাছে চাইলে আমি হয়ত সাহায্য পাব।

হাসিমুখে পুনরায় রমেন বলল, সাহায্য কি ধরনের ?

তাও আমি জানি নে—শোভা বলল, হয়ত আপনি সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেই আমি জোর পাব। মা আমাকে একেবারে ভাসিয়ে চলে গেছেন, আমার কোনও কূলকিনারা নেই।

আপনার আত্মীয়-স্বজনরা কোথায় ?

ওসব কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আমার বাবা মরবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব পরিচয় শেষ হয়ে গেছে। বাবারা ছিলেন মস্ত বড়লোক। তাঁরা কয়লা-খনিরও মালিক ছিলেন। কিন্তু আমার মায়ের কোনও পরিচয় আমি জানি নে। এই ত দুর্গাপুরের পাশেই আমরা থাকতুম—পশ্চিমের শালের জঙ্গলটা দেখেছেন ত? ওরই গায়ে—আমাদের নিজেদেরই জায়গাজমি। পুরনো ছোট বাড়িখানা এখনও আছে।

রমেন চুপ করেই কথাগুলি শুনে গেল। তারপর বলল, আপনার সামনে এসে আমি দাঁড়াব, আর আপনাদের মধ্যে কাজ-কারবার বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলবে—এ দৃশ্যটি দেখতে কেমন লাগবে ? আমার দাঁড়ানটা ওরা কেউই বরদাস্ত করবে না। বাইরের লোকের মাথা গলানো ওরা সইবে কেন ?

শোভা এবার হাসল। হঠাৎ বলল, আপনি শুধু চাকরি করতেই জানেন, জ্ঞানবুদ্ধি আপনার পাকে নি। আপনি না হয় বাইরের লোক, কিন্তু যারা আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে তারা কি ঘরের ? মানুষকে জানতে জানতেই ত সে আপন হয়। আপনাকে স্বার্থপর আমি বলি নে, তাই বলে নিজের গণ্ডির বাইরে আসতে আপনি ভয় পান কেন বলুন ত? আপনাকে ভাল করে জানার জন্যে আমাকে অনেক দিন ধরে এখানে আসতে হয়েছে, তা জানেন ? রাগ করবেন না, বড্ড নিরীহ আপনি! গা ঝাড়া দিয়ে একবার সোজা হয়ে দাঁড়ান না কেন ? জীবন মানেই যুদ্ধ।

রমেন বলল, মানলুম, আপনার এটা নিজের জায়গা, আমার

এটা বিদেশ। আপনার ঢাল-তলোয়ার আছে, যুদ্ধে আপনার ভয় নেই। আমি নিরস্ত্র, 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে'! যতক্ষণ চাকরি ততক্ষণ আয়ু, চাকরিটি যেদিন যাবে—সেদিন চারদিকে মরুভূমি। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন নদীর পাড়ে, আমি ডুবে আছি গলা-জলে।

শোভা বলল, নিন, উঠুন, ঘরের আলোটা জ্বেলে দিন্।

রমেন উঠে গিয়ে আলো জ্বেলে দিয়ে এল। কিন্তু সে তেমনিই আড়ষ্ট। ঠিক যেখানটি থেকে উঠে গিয়েছিল, সে-জায়গাটিতে আর ফিরে এসে বসবার মতো তার বোধকরি সাহস হল না। শোভা সেটি লক্ষ্য করল। এ ব্যক্তি খেয়েছে কুণ্ঠার সঙ্গে, কেননা সেই খাওয়াটার খরচ দিচ্ছে অন্যে। সহজভাবে সে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারছে না, এবং তার কারণটাও অস্পষ্ট নয়। পাছে কোনও প্রকার লোভ এবং আগ্রহের আতিশয্য প্রকাশ পায়, এজন্য এই ভদ্র এবং সুদর্শন যুবকটি সকল সময়েই সজাগ।

শোভা নম্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলল, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

হেসে উঠল রমেন। বলল, যারা চারদিক থেকে ঘিরে থাকলে জীবনধারণের একটা মানে পাওয়া যায়, সেরকম মানুষ কেউই নেই। আমি একাই।

তাহলে চাকরি-বাকরির দিকেই বা এত ঝোঁক কেন আপনার?

রমেন চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, একটি ছোট্ট জায়গায় একটি নৈতিক ঋণ আছে, সে-দেনাটি শোধ না করলে গেরুয়া নিয়ে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

ঈষৎ আগ্রহের সঙ্গে শোভা বলল, সামন্ত যদি অনুরোধ করে, কাজ আপনি করবেন?

বোধ হয়, না।

আমি যদি আপনাকে অনুরোধ করি?

রমেন বলল, আমি তা হলে সময় নিয়ে এই কথাই ভাবব যে, আপনার সঙ্গে আমিও মরীচিকার পেছনে ছুটছি।

কেন?

তার কারণ আপনার সমস্ত ব্যাপারটার আগাগোড়াই আমার ভালো লাগে নি। এসব উঞ্ছবৃত্তি, এদের মধ্যে আপনি বেমানান। এর মধ্যে নোংরা আছে, ইতরমো আছে, অপমান আছে।

শোভা বলল, তা হলে শুনুন, সামন্তর হাতে মা তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন একটা লেখাপড়া করে। সে-দলিল আছে আমার কাছে। সামন্ত হোটেল খুলবে, কাজ করবে এবং লাভের অংশ থেকে চার আনা ভাগ পাবে। আজ আমি নিজের দাবী জানাতে চাচ্ছি, এটাকে নোংরামি বলছেন কেন? আমাকে ফাঁদে ফেলে অল্প টাকায় রাণীগঞ্জের বাড়িখানা গ্রাস করতে চাইছে লাহুরাম। আমি লড়াই করছি, এটাকে ইতরমো বলছেনই বা কেন? এর ওপর আবার ওই জমি-জায়গা-বাড়ি দখল করতে চাইছে এখানকার জনকয়েক ঠিকেদার—আপনি কি আমাকে হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে থাকতে বলেন?

রমেন বলল, কতদিন আপনি যুদ্ধ চালাতে পারবেন?

অন্যায়ের প্রতিকার যতদিন না হয়।

হেসে উঠল আবার রমেন, আমি কি আপনার সেই ধর্মযুদ্ধের হাতিয়ার হব?

শোভাও হাসল।—না, হাতিয়ার নয়, আপনি হবেন মন্ত্রী।

অর্থাৎ আপনি থাকবেন ঘরের মধ্যে, আর আমি গালমন্দ খেয়ে বেড়াব পথে ঘাটে।—এ হয় না, শোভা দেবী। এসব আপনার পক্ষে শুধু বেমানানই নয়, আপনার পক্ষে নিরাপদও নয়। বরং এই সব জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা দেখুন।

কেমন করে বেরুবো ?

রমেন বলল, এই কদিনে আমি যা বুঝলুম, ওরা আপনার জন্য মিটমাটের দরজা খোলাই রেখেছে।

শোভা বলল, আপনি মিটমাট করাতে পারবেন ? উভয় পক্ষের স্বার্থ সমানভাবে বজায় থাকবে, এতে কি ওরা রাজী হবে ?

আপনার পক্ষের উকিল যদি কেউ থাকেন, তিনিই এসব আপোষ মীমাংসা করতে পারবেন।

হাসিমুখে শোভা বলল, তার মানে মিটমাটের মধ্যেও আপনি ধরা ছোঁওয়া দিতে চান না। বড্ড স্বার্থপর আপনি। দু দণ্ড বসে গল্পগুজব করতে এলুম, আপনি আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচেন। মেয়েদের ওপর বড্ড ঘেন্না আপনার।

রমেন হাসল। বলল, বড্ডই অবিচার হচ্ছে আমার ওপর। ফটিক এখুনি এসে পড়বে। সুতরাং এইটুকু সময়ের মধ্যে তর্ক তুলে আমি যদি বোঝাতে যাই যে, মেয়েদের ওপর আমার একটুও ঘেন্না নেই, তাহলে সময় কুলোবে না।

শোভা এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, বেশ, এ ঝগড়া আজকের মতন তোলা থাক, অন্যদিন হবে। আমি বড়ই বেকায়দায় পড়ে আছি, তাই আপনার সব কথার জবাবও দিতে পাচ্ছি নে। নিন সরুন, শতরঞ্চি তুলে দিই।

থাক থাক, এ কি করছেন ?—রমেন ব্যস্ত হয়ে বলল, অতিথিকে দিয়ে নিজের ঘরের কাজ করিয়ে নেব, এ ভারি লজ্জার কথা !

শোভা বলল, রাজুর কথাই সত্যি মনে হচ্ছে এখন। ওই যে, আমার ওখানে যাকে দেখে এলেন সেদিন।

কি বলেছে সে ?

ঠিক বলেছে। আপনার আসবার পর রাজু বললে, দিদি, মানুষটা বোধ হয় একটু চাপা। আমি বললুম, চাপা নয়, রাজু—

প্রাণশক্তিটাই কম। রাজু বললে, না দিদি, একটু যেন কাঠখোট্টা। যে মেয়ে ওর হাতে পড়বে তার কপাল ভাল নয়।

রমেন এবার খুব হেসে উঠল, বলল, রসকস ছাড়া বুঝি মেয়েদের সঙ্গে বনিবনা হয় না ?

শতরঞ্চিখানা তক্তার উপর পেতে বিছানাটা সযত্নে গুছিয়ে শোভা সহসা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। বলল, নীরস যুক্তির ওপরেও বনিবনা হয়, সেটা নিতান্তই বোঝাপড়া। তবুও শুনে রাখুন, রসছাড়া মেয়ে নেই। যদি থাকে, কোনদিন সেই পিশাচীর মুখ দেখবেন না, এই অনুরোধ।

দরজার কাছে চুপ করে স্বল্পভাষী রমেন হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল, জীবনের অনেক ক্ষেত্র থেকে এ মেয়ে উঠে এসেছে ঘা খেয়ে। লৌহ পদার্থটা যেন ইস্পাতে আজ পরিণত। যৌবনগন্ধ রয়েছে এর চারিদিকে ছড়ানো বটে, কিছু মোহমদিরতাও উচ্ছলিত—কিন্তু এর ত্রিসীমানায় লঘুলাবণ্যের আলোড়ন নেই, এর কাঠিন্যের মোড়ক বড় সুস্পষ্ট।

আলনার কাপড়চোপড়গুলি শোভা গুছিয়ে রেখে দিল। তারপর মশারিটি টাঙিয়ে এদিক ওদিক সুবিন্যাস করে দিয়ে এক-সময় বলল, নিন, ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে আসুন—

আমি কি যাব বলছেন আপনার সঙ্গে ?

শোভা বলল, ভয় নেই মশাই—কেউ দেখলে লোকনিন্দা হবে এই ভয় ত ? বলুক না পাঁচজনে পাঁচ কথা, আপনার কি ?

রমেন বলল, ফটিককে কি ওখানে পাওয়া যাবে ?

ফটিক আমাকে না দেখলে স্টেশনে অপেক্ষা করবে, চলুন।

ঘরে তালা দিয়ে রমেন বেরিয়ে এল। কোয়ার্টারগুলির পরে এগিয়ে গেলে ধূ ধূ করছে রাত্রির প্রান্তর। বোধহয় মেঘ করেছিল আকাশের একদিকে, হাওয়া দিয়েছে খুব জোরে। কিছুদূর অগ্রসর

হয়ে শোভা বলল, আপনি নতুন কালের মানুষ, কিন্তু পুরনো কালের মন আপনি বোধ হয় ছাড়তে পারেন নি। ভয় সঙ্কোচ পুরনো সংস্কার—আষ্টেপৃষ্ঠে আপনাকে জড়িয়ে রয়েছে। এগুলো ভাঙতে পারেন না? কিচ্ছু মানি নে, এ কথা বলতে কি বাধে আপনার?

হ্যাঁ, বাধে।—রমেন বলল।

কেন বলুন ত?

কিয়ৎক্ষণ ধরে রমেন চুপ করে হাঁটতে লাগল। তারপর এক সময় বলল, গড়তে শিখি নি বলেই বোধহয় ভাঙতে ভয় করে।

শোভা চলতে চলতে বলল, আপনি যেদিন আমার সব গল্প শুনবেন, হয়ত সেদিন আমাকে এত ঘেন্না করবেন না। তবুও ভেবে দেখুন ত, ভেঙ্গে দিয়ে যায় একদল, গড়বার জন্যে এগিয়ে আসে অন্য দল। বাইরে কোথাও একটুও ভয় নেই এই কথা জানলুম যেদিন বাইরে এলুম। আপনিও আপনার জাল ছিঁড়ে বাইরে এসে দাঁড়ান্ না কেন, দেখবেন---সাহস নিজের থেকেই জন্মাচ্ছে। ভয় হল সেই ভয়ানক শক্ত জাল।

মেয়ের মুখ থেকে এসব আলাপ শোনার অভিজ্ঞতা রমেনের এই প্রথম। কান পেতে সে শুনল, এগুলো শেখা বুলি নয়, মন থেকে কথা উঠে আসছে। এর উৎস আছে কোথাও, কিন্তু কোন আভাস তার পাওয়া যাচ্ছে না। সেইজন্য রমেন চুপ করেই চলতে লাগল।

স্টেশনের ধারে এসে শোভা বলল, আপনি প্লাটফরমে একটু অপেক্ষা করুন, আমি মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরব।

কোথায় যাবেন?

যাব সামন্তর ওখানে টাকা নিতে। হাতের সই ছাড়া লোকটা টাকা দেবে না। আপনি দাঁড়ান, ওই মেছোহাটায় আপনার গিয়ে কাজ নেই। আসছি আমি—

শোভা হন হন করে রেল লাইন ডিঙিয়ে ডান দিকে ফিরে

বাজারের দিকে চলে গেল। রাত আটটা বেজে গেছে। রমেন একবার এদিক ওদিক তাকাল, কিন্তু ফটিককে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। গাড়ি আসতে কিছু দেরি আছে। কিন্তু গাড়ি এলে তাকে সঙ্গে যেতে হবে কিনা শোভা সে কথা বলে যায় নি। রমেন এসে একখানা বেঞ্চের ধারে বসল।

আধমরা জগতের যে বাসাটায় বসে স্বল্পে তুষ্ট জীবনটা এতদিন ধুকধুক করছিল, সহসা সেই বাসাটা যেন ঝড়ের তাড়নায় নাড়া খাচ্ছে, নির্দিষ্ট নিয়মানুগত্যটা স্থির থাকতে পারছে না। বিপদের সঙ্কেত কিনা বোঝা যাচ্ছে না---কিন্তু নতুনের উদ্দাম একটা তরঙ্গ যেন ধেয়ে আসছে শোভার সঙ্গে—ওটা ভাসিয়ে নিয়ে যেতেও পারে, আছড়ে মারতেও পারে। তবু যেন ওই প্রবল তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে আনন্দ আতঙ্ক আর উদ্দীপনা মিলে মিশে রয়েছে এতে সন্দেহ নেই। রমেন চুপ করে বসে রইল বটে, তবে তার স্তিমিত রক্তের স্রোতে বিপ্লবের জোয়ার উতরোল হয়ে উঠেছিল।

মিনিট পনেরর মধ্যেই শোভার লীলায়িত ভঙ্গীটি দূর থেকে দেখা গেল। কাছে এলে চোখ তুলে তাকানো যাবে না, তাই দূরের থেকেই রমেন দেখে নিল দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতীকে। প্রাকৃতিক গাম্ভীর্যটি স্পষ্ট, দুই পাশে ভ্রুক্ষেপ নেই একটিবার, নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ, আপন তেজস্বিতায় উদ্দীপ্ত।

শোভা কাছে এগিয়ে এল এবং নিঃসঙ্কোচে বসল রমেনের পাশে। সে হাঁপাচ্ছিল। তারপর বলল, কি আছে বলুন ত আপনার মধ্যে ? আপনার জন্যে ছুটতে ছুটতে এলুম, দেখলেন ত ? ফটিক হতভাগা ওখানেই ছিল, আসছে এক্ষুনি। কি ভাবছিলেন এতক্ষণ ?

রমেন বলল, আপনার কথাই ভাবছিলাম।

কি ভাগ্যি আমার—শোভা হাসল।

রমেন বলল, ভাবছিলুম এই, আপনি কারও প্রিয়পাত্রী হতে পারবেন না। আপনার মধ্যে কোথায় যেন একটা সাংঘাতিক পুরুষের বাসা আছে।

বেঁচে গেছি।—একটু গলা নামিয়ে শোভা স্বচ্ছ হাসি হেসে আবার বলল, বেঁচে গেছি। সকাল-সন্ধ্যে যখন তখন পথে ঘাটে রেলগাড়িতে আনাগোনা করতে হয়। তার ওপর এ অঞ্চলটা খুব সুবিধেরও জায়গা নয়। পাঁচটা লোক পাঁচদিক থেকে যদি প্রিয়পাত্রী ভেবে পিছু নেয়, সে বড় বিপদ। সেইজন্যেই ত চাদরমুড়ি দিয়ে আনা-গোনা করি।

হাসিমুখে রমেন বলল, চাদরমুড়ি আরও সাংঘাতিক। আপনি হয়ত ভাবলেন সকলের নজর এড়িয়ে গেলেন, কিন্তু চোখ যাদের আছে তাদের ফাঁকি দিতে পারলেন কি ?

বড় বড় চোখে শোভা তাকাল রমেনের দিকে এবং দূরের আলোটা এসে পড়ল তার চোখের তারায়,—সেই চোখে হীরকের দীপ্তি ঠিকরে যায়। শোভা অনুযোগ করে বলল, এবার বুঝি আপনার মুখে কথা ফুটল ?

রমেন বলল, আপনি কি আমাকে চুপ করে থাকতে দিলেন ? মুখে যদি কথা ফোটে, মনে যদি ফুল ফোটে, তার জন্য আপনিই দায়ী, আমি নয়।

দূরের সিগনাল ডাউন হল এতক্ষণে। এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ফটিক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। সে একেবারে টিকিট কিনে এনেছে।

একটু বাদেই গাড়ি এসে পড়ল। থার্ডক্লাশের একটি কামরায় উঠে একটু বিমর্ষ মুখে শোভা বলল, এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার দোকানদারি চেহারাটাই আপনার কাছে রেখে গেলুম। গাড়িখানাও যেন বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়ল।

হাসল রমেন। বলল, হোটেলের মালিকের চেহারাটাই বা মন্দ কি। পেট ভরে খাইয়ে গেলেন, এও কম লাভ নয়।

গাড়ি ছেড়ে দিল। মুখ বাড়িয়ে শোভা পুনরায় বলল, যদি দরকার হয়, ডাকলে যেন পাই—কেমন?

রমেন হাসিমুখে শুধু ঘাড় নেড়ে হাত তুলে নমস্কার জানাল।

গাড়িখানা দেখতে দেখতে দূর থেকে দূরে চলে গেল। সেইদিকে তাকিয়ে রমেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে সে যখন পা বাড়াবার উপক্রম করছে সেই সময় নন্দ এসে একেবারে তার সামনে দাঁড়াল। বুঝতে পারা গেল, নন্দ এই কাছাকাছিই কোথাও অপেক্ষা করে ছিল। শোভার সামনে এসে পড়তে তার সাহস হয় নি।

আপনি কি বাসায় ফিরছেন? নন্দ জিজ্ঞাসা করল।

রমেন বলল, হ্যাঁ, এইবার যাব। কেন বল ত?

আপনার খাওয়া-দাওয়া কখন হবে?

হাসিমুখে রমেন বলল, তুমি ঝোলাসুদ্ধ যে-পরিমাণ খাবার এনে হাজির করেছিলে, তারপরেও কি আবার খাবার কথা ওঠে?

নন্দ বলল, তা হ'ক, এমন আর কি। তাই বলে রাত-উপোস ভাল নয়। জামাইবাবু পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে। উনি বললেন, একলা ঘরে বসে কি করবেন, তার চেয়ে এ দোকানে এসে একটু গল্পগুজব করুন না কেন? অমনি সবাই মিলে খেয়ে দেয়ে নিলেই হবে।

রমেন ভাবল, কে জানে, ভবিষ্যতে হয়ত সামন্তকে তার অন্নদাতা বলেই মানতে হবে, সুতরাং এসব সামান্য ব্যাপারে অবাধ্য হয়ে লাভ নেই। একটু থতিয়ে সে বলল, তা মন্দ বল নি নন্দ, ঘণ্টাখানেক তোমাদের ওখানে কাটিয়ে আসা চলে বইকি।

তা হলে আসুন। সামন্ত মশাই খুব খুশী হবেন। এটা জানেন

ত, জামাইবাবুর আসল নাম হল, গোলক সরকার। তবে কিনা মুখুজ্যেদের গিন্নি আদর করে ওঁর নাম রেখেছিলেন, সামন্ত। এই নামটাই চলে এসেছে। হোটেলের নামও হয়েছে, 'সামন্ত রেস্টুরেণ্ট'।

লাইন পেরিয়ে বাজারের সীমানা ছাড়িয়ে ওরা দু জন কদম-গাছটার তলা দিয়ে এসে হোটেলে উঠল। গোলক যেন একটু উৎসুক হয়েই ছিল। বারান্দায় উঠতে দেখেই সে মিষ্টমুখে অভ্যর্থনা জানাল। বলল, হ্যাঁ ভাই, আমিই ডাকতে পাঠালুম। এই ত, এ দোকান আর ওই দোকান—তবে কিনা ভাই, ও দোকানটার মেজাজ হল একটু সাহেবী! হাজার হ'ক, শহর বাজার ত। এ দোকান কিন্তু একটু গেরস্থপোষা। তা ছাড়া আমি এখানেই থাকি কিনা—ওরে নন্দ, রমেনবাবুকে বসতে দে গুছিয়ে।

এ দোকানের ভিতর-বাহির রমেনের অচেনা নয়। উঠোন-খামার মিলিয়ে জায়গা অনেকখানি। সামন্তর বউ থাকে একেবারে ভিতর দিকে, সে-মেয়েছেলেটা নাকি বাতের ব্যামোয় পঙ্গু। দোকানের ঠিক পিছনে দু খানা ঘর খালি, কিন্তু অনেক সময় সেখানে তাস-পাশা নিয়ে খুব হৈ চৈ চলে। শোভা বোধ করি এই মহলটি থেকেই রমেনকে এতদিন ধরে লক্ষ্য করে এসেছে। মেয়েদের চোখ দেওয়াল ভেদ করে যায়।

গোলক বলল, শুনছ ত ভেতরের হৈ-হুল্লোড় ? উঁকি মেরে দেখে এসো, চাঁদের হাট বসেছে।—গলা নামিয়ে রমেনের কানের কাছে মুখ এনে গোলক পুনরায় বলল, চারিদিকে গোয়েন্দা, মদ বিক্রির কি আর যো আছে ? তবে যারা খায় তাদের জন্যে একটু ছুটোছুটি করতে হয় বইকি।

রমেন বলল, মদ যখন অনেকে খায় তুমি বেচলেই পার ?

না না, সে কি কথা। দোকানের বদনাম আমি করতে পারব না। তবে হ্যাঁ, এনে দিলে কমিশনটা পাই। তা ধর টাকায় টাকা

আসে। এসব রোজগার ত আর খাতায় তোলা যায় না। ওই নন্দই, ও ডিপার্টমেন্টটা ওর হাতেই তুলে দিয়েছি।

তা হলে তুমি কেমন করে হিসেব দেবে ঠাকরুনকে?

গোলক বলল, তুমি ধরেছ ঠিক, হাজার হ'ক সেয়ানা ছেলে ত। ঠাকরুনের গায়ের জ্বালা ত ওর জন্যেই। ভাত রুটি বেচলে কি আর ফুলে-ফেঁপে উঠত। অথচ বলতেও পারি নে ঠাকরুনকে ভেতরের কথাটা—চারদিকে গোয়েন্দা। এই দেখ না কেন, ধমক দিয়ে একটু আগে ঠাকরুন একশ টাকা বার করে নিয়ে গেল। মেয়েমানুষ কিনা, কড়া কথা বলতেও পারি নে।

কথাগুলি বাহ্যতঃ এলোমেলো, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরস্পরের সঙ্গতি আছে। গত কয়েক দিনে রমেন এটি বুঝে নিয়েছে। এক সময় রমেন বলল, কিন্তু গোলমালটা যে গোড়া থেকেই বেধে রয়েছে সেটা কেমন করে তুমি সামলাবে বল? উনি যদি মামলা করেন তাহলে ফৌজদারি মামলাও করবেন মনে হচ্ছে।

গোলক চট করে থেমে বলল, তুমি জানলে কেমন করে? পেটের কথা বার করে নিয়েছ বুঝি?

কি আশ্চর্য, এ যে হাঁ করলেই বুঝতে পারা যায়। এ দোকান থেকে যে মদ-গাঁজা-চরস—এসব বিক্রি হয়, উনি সব খবর রাখেন। ওঁকে খুব সাদাসিধে মেয়ে মনে কোর না, সামন্ত মশাই।

খাতাখানা বন্ধ করে গোলক বলল, এস ভাই একটু আড়ালে যাই। তুমি সবই জান দেখছি। তাহলে এও বলি ভাই রমেনবাবু, আমি একা দোষী নই। টানাটানি করলে অনেকেই রেহাই পাবে না।

উঠোনের নিরিবিলি অন্ধকারে গোলক রমেনকে ডেকে নিয়ে এল। বলল, তুমি কেমন করে খবর পেলে সব, একটু খুলেই বল না ভাই?

অসীম কৌতুক চেপে রেখে রমেন কেবল একটু হাসল। গোলক বলল, তা হলে তোমাকে ভেতরের কথাটা বলি ভাই। ও-ঘরে যারা তাস-পাশা খেলছে তারা কে জান? জান, কি জন্যে তারা এসে এখানে এক সঙ্গে মেলে? অবিশ্যি হ্যাঁ, বিশ-পঞ্চাশ টাকা দেয় বটে আমাকে মধ্যে মাঝে। কিন্তু জেনে রেখো, কালনেমীর লঙ্কাভাগ হয় যা কিছু সব এখানে। কিছু না কিছু ভাগ আছে সকলের। একজন আবার একটা বাক্স রেখেছে আমার এখানে, বুঝেছ? আমি কি ছাই ওসব কাগজপত্তর বুঝি?

রমেন বলল, তোমার ঠাকরুণ এ সমস্তই জানেন। সেইজন্যেই ত আমার ভয়, সামন্ত মশাই—

কি ভয়?—সামন্তর গলা যেন শুকিয়ে উঠল।

রমেন বলল, এটা বুঝতে পার নি, অত অল্প বয়সের মেয়ে এমন বিশ্বাসের জোর কোত্থেকে পায়? এমন জিদ ধরেই বা কেন, ভেবে দেখেছ? আমি যতদূর আঁচ করতে পারলুম, কলকাতার জন চারেক উকিল ব্যারিস্টার আছেন ওঁর সঙ্গে। তারা ভয়ানক ঝুঁদে লোক। ব্যাপারটি বড়ই জটিল।

গোলক বলল, কিন্তু আমাকে যে বার বার বলেছে, হিসেবের দাবী করেই মামলা ঠুকবে? মামলা হবে দেওয়ানি।

রমেন হাসল। বলল, সামন্ত মশাই, তুমি ভারি সরল।

সরল!—গোলক বলল, না না, সরল না, বোকা। বোকা বলেই ত ভাবছি ওই ঠাকরুণটি সরল। তা হলে বলো, রাত পোয়ালেই আমাকে একটা ব্যবস্থা করতে হয়। শেষে কি যাবজ্জীবন জেল খাটব? তোমার কথায় আমার গলাটা শুকিয়ে উঠল।

কি যে বলো, সামন্ত মশাই। জেল—জেল ত এখন স্বর্গ। ধরো, আমার যদি চাকরি যায়, তাহলে ভয় কি, লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে জেলে গিয়ে ঢুকব। যদি ছ মাস হয়, ঝাণ্ডা উড়িয়ে আবার মেয়াদ বাড়াব।

এ কিন্তু জেলের চেয়ে অনেক সাংঘাতিক—তবে সে-সব কথা এখন থাক। যার যা কপালে আছে তাই হবে। আরেক কথা, ওই যে ও-ঘরে রুই-কাৎলার কথা বললে, ওদের নিয়ে জড়িয়েই তোমার চারদিকে নাকি জাল ফেলা হবে, এও শুনেছি।

গোলক এবার যেন কেঁদে উঠল। বলল, কি বলছ তুমি? এত কথা তুমিই বা জোগাড় করলে কোত্থেকে?

রমেন বলল, পুলিসের ভেতরের কথাটা শুধু তুমিই কি টের পাও, আর কেউ পায় না?

কিন্তু পুলিসকে ঘুষ খাওয়াতে কতক্ষণ?

রমেন হঠাৎ হেসে উঠল। সে-হাসি বড়ই অর্থপূর্ণ।

চুপ করো রমেনবাবু—অত চেঁচিয়ে হেসো না, কেউ শুনবে। অত লোক ওদিকে, হয়ত আমাদের দিকে ওদের চোখ আছে।

রমেন চুপি চুপি বলল, সে-সব পুলিস আজকাল আর নেই, তা জান? পুলিসও আজকাল গোয়েন্দার ভয়ে কাঁপে। ওটি আর হবার যো নেই।

তাহলে আমি কি করব বলতে পার?

হ্যাঁ পারি। আমি বলি, ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে ফেলাই ভাল।

কেন, তোমায় কিছু বলে গেল বুঝি?

রমেন বলল, হ্যাঁ, সে অনেক কথা। তবে এখনি তুমি ভয় পেয়ো না। আমি বোধ হয় ঠিক সময় তোমাকে খবর দিতে পারব।

গোলক বলল, তুমি যদি পার রমেনবাবু আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব বলে রাখলুম। আ, এই আমার কপালে ছিল।

বেশ, তাহলে আমাকে একটু সময় দাও। ওঁর মনের কথাটা আরেকবার ভাল করে জানি। তাছাড়া উনি কি কি শর্তে মিটমাট করতে পারেন সেটাও জেনে নেওয়া দরকার বইকি।

রমেনের প্রত্যুৎপন্ন দুষ্টবুদ্ধি যেন সহসা চাকাটা ঘুরিয়ে এই লোকটার আসল চেহারাটা বার করে আনল। কিন্তু শেষরক্ষা হবে

কিনা সে সম্বন্ধে রমেন অনিশ্চিত। তবে গোলকের মুখে চোখে যে দুর্ভাবনা ও শঙ্কার ছায়াটা নামল সেটা সামান্য নয়। সর্বাপেক্ষা কৌতুকের বিষয় এই যে, লোকটা পুরনো পাকা গোমস্তার চাতুরী সত্ত্বেও রমেনকে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করে বসল। যেন রমেন তার নিজেরই লোক।

বেশিক্ষণ এখানে বিশ্রম্ভালাপ করার আর সুযোগ রইল না। গোলক বলল, ভালয় ভালয় যদি সব মিটে যায় ভাই, আমি কথা দিচ্ছি—তোমার চাকরি থাক আর যাক, আমার এখানে তোমার কাজ বাঁধা রইল। ব্যাপারটা কি জান ভাই, তোমার ওই ঠাকুরুণকে আমি বিশ্বাস করি নে। সেই ছোটবেলা থেকে ওর মা যখন ওকে নাচ-গান শেখাত, তখন থেকেই দেখে আসছি মেয়েটা খামখেয়ালী। যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে।

রমেন একটু আকৃষ্ট হল। বলল, ভারি মজা ত ? কি রকম শুনি ?

সে অনেক বড় গল্প। আরেকদিন সব বলব। তবে এইটুকু জেনে রাখ একদিকে মুখুজ্যেদের বদরক্ত, অন্যদিকে মায়ের স্বভাব-চরিত্রের প্রভাব।

রমেন সহসা মুখ তুলে তাকাল।

গোলক সামলিয়ে নিয়ে পুনরায় বলল, না না, তেমন কিছু নয়, ওসব আজকাল অনেক ঘরেই চলে যাচ্ছে। আর এ হল তোমার বাঙলা দেশ। ওসব ঘটনা এখন পথে ঘাটে।

রমেন হঠাৎ যেন একটু বিরক্ত হয়েই বলল, ঘটনাটা একটু খুলেই বল না, সামন্ত মশাই ?

পাছে রমেন রুষ্ট হলে ভবিষ্যতে মন্দ কিছু হয়, এ জন্য গোলক তাকে নিয়ে বাইরে এল। কদম গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে একটু ভূমিকা ফেঁদে বলল, ওরা হল আদি বীরভূঁয়ের মুখুজ্যে। নবাবী আমলে ওরা বর্ধমান জেলায় জায়গীর পেয়ে চলে আসে। কোমরে

পৈতা জড়িয়ে ওরা চাষবাসও করেছে অনেককাল। একালে ওদের নাম হয়েছিল ডাকাতে মুখুজ্যে। তাদেরই একটা শাখা পাঁচতলীর মুখুজ্যে হল এরা। বনজঙ্গলের মালিক। মস্ত বড় ঘর, চারদিকে বোলবোলা, রাবণের গুষ্টি। তাদেরই ছোট তরফের সেজ ছেলে বোকেন মুখুজ্যে ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে।

তারপর ?

তারপর ওই বেদেডোবার বাড়িতে এসে ওঠে। আসবার সময় বুড়িবিবির মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে আসে।

বুড়িবিবি কে ?

ওঃ সে এক ডাকসাইটে খ্যামটা নাচওয়ালী ছিল সেকালে। আমাদের ছোটবেলার টাইম, সে আজ ত্রিশ বছরের কথা। মেয়েটার নাম ছিল সিন্ধুবালা। কিন্তু মেয়ে বড় ভাল। শোভা হল সেই সিন্ধুবালারই মেয়ে। তবে কিনা সিন্ধুবালার কপাল মন্দ, সাত বছরের বেশি বোকেনবাবু বাঁচল না। এদিকে লেখাপড়ার জোরে সিন্ধুবালা পেয়ে গেল বেদেডোবার জমি জায়গা আর রাণীগঞ্জের বাড়িখানা। সিন্ধুবালা মারা গেছে এই বছর পাঁচেক।

রমেন বলল, তুমি তাঁর কাছ থেকে টাকাটা কখন নিলে ?

গোলক বলল, তা ধর, গিন্নি মরবার বছরখানেক আগে।

কাহিনী কি এখানেই শেষ ?—রমেনের মুখখানা যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল।

হাসিমুখে গোলক বলল, না রে ভাই, সে সব সাতকাণ্ড রামায়ণ।

রমেন হাসতে পারল না। শুধু বলল, বিকেলবেলা তর্কের মাঝখানে তুমি যে রঙের গোলাম হাজির করবে বলে একবার ভয় দেখালে, সেটা কি এই ?

গোলক বলল, ও, তুমি সবটাই শুনে যেতে চাও দেখছি! হ্যাঁ, এটা তারই একটা অংশ সবটা নয়।

সেটা বল, শুনেই যাই।

না দাদা, সেটা আজ থাক্‌। আমার মুখ দিয়ে শুনতেই যদি হয়, তাহলে ঝগড়া-বিবাদ মিটলে একেবারে শুনে নিয়ো। আজ তোমার মেজাজটাও তেমন ভাল নেই। তুমি ঘরে যাও, আমি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রমেন বলল, না, সামন্ত মশাই, খাবার আজ পাঠিয়ো না। পেট আমার ভরা আছে। আচ্ছা, আজকের মতন চললুম।

রমেন হন হন করে এগিয়ে গেল স্টেশনের দিকে।

তিন

গত কয়েকদিন অবধি একটা চিন্তা-বিভ্রম ঘটেছিল বইকি। সন্দেহ করেছিল রমেন—গোলযোগ কোথাও কিছু একটা আছে। শোভার জীবন-যাপনের চেহারাটা একটু নতুন, একটু বা বিচিত্র, এটা মনে হবার কারণ ঘটেছিল প্রথম থেকে। তা ছাড়া এও এক অভিনব বস্তু যে, সরকারি চাকরি বজায় রাখার জন্য সরকারের কাছে ধরনা না দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল একটি যুবতী মেয়ের কাছে —যার সামাজিক পরিচয়টা পাঁচজনের চোখে যথেষ্ট গৌরবজনক মনে হবে না। সে নিজে নির্বোধ সন্দেহ নেই, কিন্তু যে-দলটার মধ্যে এই ধরনের একটা চক্রান্ত আছে, তারা রেহাই পায় কেমন করে, এও কৌতুকের বিষয়।

গোলকের কাছে সেদিন রাত্রে ও-ব্যাপারটা শোনার পর থেকে রমেনের চট্‌কা ভেঙে গিয়েছিল। এ ধরনের লোক তার আগে দেখা ছিল না, এবং কালক্রমে এমনি একটা অদ্ভুত সমাজ যে গড়ে উঠেছে—তার সম্বন্ধেও সে অজ্ঞ। হুগলী জেলায় তার বাড়ি, এবং গরীব গেরস্থ ঘরের ছেলে সে। লেখাপড়া একটু আধটু শিখেছে সে

চাকরি করার জন্য—তার জীবনধারণ এবং মরণবাঁচন—ছুটোই চাকুরিকেন্দ্রিক। দশটা-পাঁচটার জীবনের মধ্যে চলাফেরা করতে পারলেই সে সুখী। এর বাইরে যে জীবনবৈচিত্র্য, তার সন্ধান তার জানা ছিল না। কোনও নাচওয়ালীর নাতনীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হবে—এ তার পক্ষে অভাবনীয় ছিল। আধুনিক সমাজ, স্বাধীন জীবন, মেয়েদের স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্য—এসব তার কাগজে পড়া। তবে চাকরিতে ঢুকে তার চোখ যেমন খুলেছে, অনেক পুরনো ধারণাও তেমনি তার বদলেছে।

কিন্তু সেই পরিবর্তন অন্য বস্তু। সেটা থাকে চিন্তামানসের মধ্যে, তার অনেকখানি অংশ কল্পনাগত। এখানে যে ঘটনাচক্রে সে পড়ে গিয়েছে, সেটা প্রত্যক্ষ, সেটা অতি স্থূল। যে দ্বন্দ্বের দোলায় সে পড়ে গেল, সেটা মানস-নৈতিক, সেখানে প্রতিক্রিয়াটি অত্যন্ত রূঢ় এবং বাস্তব। সে জেনে এসেছে নরনারীর চিরকালের সম্পর্কটা বিবাহের ওপর দাঁড়িয়ে—সেখানে আছে ঘটকালি, মেয়ে দেখা, পাকাপাকি, বরানুগমন, শঙ্খধ্বনি, মালাবদল, বাসি-বিয়ে—এক এক পর্যায়ে এক এক অনুষ্ঠান। এই আনুষ্ঠানিক রীতির সঙ্গে সামাজিক সংস্কার রয়েছে জড়িয়ে। আছে বিশ্বাস, আছে শ্রদ্ধা—এবং সর্বাপেক্ষা আছে সমাজভিত্তির স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তা। হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচওয়ালী বুড়িবিবির মেয়ের হাত ধরে বলা চলে না, তুমি দেখতে বড়ই রূপবতী, অতএব আমার শোবার ঘরে উঠে এসো।—সেখানে সামাজিক মন এবং সমষ্টির জীবন কেঁপে ওঠে, বহুকালের পরীক্ষোত্তীর্ণ একটা ব্যবস্থাপনার ভিত্তিমূল নাড়া খায়। একথা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, মানুষ আর জন্তুর মধ্যে তফাৎ আছে।

এমনি ধারা কতকগুলো এলোমেলো কথা মাথায় নিয়ে যখন রমেনের দিন কাটছে, সেই সময় ছোট্ট একখানা সরকারি চিঠি তার

হাতে এলো। সে চিঠির মর্ম হল এই যে, যেহেতু স্টোর ডিপার্ট-মেণ্টের কাজ এখনও কিছু বাকি আছে এবং অবশিষ্ট মালপত্র স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, সেইজন্য রমেন চৌধুরীকে এতদ্বারা জানান হচ্ছে যে, তিনি যেখানে বহাল আছেন, আপাতত আরও কিছুদিনের জন্য সেখানেই বহাল থাকুন। প্রকাশ থাকে যে, এই নির্দেশের দ্বারা গভর্নমেণ্ট উক্ত রমেন চৌধুরীর কার্য-কালের সম্বন্ধে কোনও প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হচ্ছেন না।

অর্থাৎ, আরও কিছুদিনের জন্য চাকরিটা তার রয়ে গেল। কিন্তু ঠিক কতদিনের জন্য তা জানা গেল না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে রমেন চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। একবার কেবল মুখ তুলে দেখল, দেওয়ালে টাঙানো স্বামী বিবেকানন্দ-মার্কা ক্যালেণ্ডারে মাসকাবারের আর মাত্র দু দিন বাকি আছে।

যে পিওনটা তার সই নিয়ে এইমাত্র তার টেবিলে চিঠিখানা দিয়ে গেল, তাকে আনা আষ্টেক বকশিশ দেবার জন্য রমেন একবার উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিল বটে। কিন্তু ততক্ষণে লোকটা চলে গেছে নিজের অন্য কাজে। পয়সাটা বেঁচেই গেল।

অতঃপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে যখন আরেকবার চিঠিখানা পড়ে নিয়ে মস্ত খাতাখানার ওপর মাথা নীচু করে কাজে মন দিল, তখন তার একবারও মনে হল না যে, আজকের দিনটা হল শনিবার, এবং আপিসের কাজ সেরে সবাই চলে যাবার পর ওই পিওনটাও তার শেষ কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। যখন তার খেয়াল হল, দেখল জমাদারের ঝাড়ুর ধুলোয় হল্ ঘরটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

খাতাখানি তাড়াতাড়ি বন্ধ করে রমেন বেরিয়ে এল।

খবরটা গোলককেই আগে দিতে হয়, কেন না তার বিশেষ

আগ্রহ ছিল প্রথম থেকে। কিন্তু গোলকের দোকানের দিকে তার পা উঠল না। যে কাণ্ড সে বাধিয়ে এসেছে সেদিন রাত্রে, তারপরে মুখ দেখানটা ভয়ের কথা। কেন যে তাকে সেদিন অমন করে ভূতে ধরেছিল কে জানে। এ মিথ্যাচরণ যদি ধরা পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে গোলকের শত্রুতা তার জন্য রইল চিরদিন। না, হোটেলের দিকে তার যাওয়া চলবে না।

রমেন অন্যদিকে ফিরল। জামার নীচের পকেটে চিঠিখানায় সে হাত বুলোচ্ছিল। ঈষৎ উল্লাসক্রমেই গলাটা বোধ হয় তার শুকিয়ে উঠেছে। এক পেয়ালা চা আর একটা চপ খেয়ে নিলে মন্দ হত না। না, থাক। এখন অনেক দেনা তাকে শোধ করতে হবে, বেপরোয়া হলে চলবে না।

কোয়ার্টারের কাছাকাছি এসে সে দেখল, একখানা জীপগাড়ি কাদের যেন দাঁড়িয়ে। মনে পড়ে গেল আজ শনিবার। ঠিকাদার-দের সঙ্গে এঞ্জিনীয়াররা এই দিনটিতে যায় বাগান-পার্টিতে। কি জন্য যায় সে আলোচনা বাহুল্য। কিন্তু রমেন একটু অবাক হল যখন দেখল ফটিক নেমে এল গাড়ি থেকে। এগিয়ে এসে হাসিমুখে রঙিন খামের একখানা চিঠি দিল রমেনের হাতে। চিঠিখানা আঠা দিয়ে জোড়া। ফটিক বলল, আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

খামখানা ছিঁড়েই ফেলতে হল। চিঠি বার করে প্রথম চোখে পড়ল শোভার হাতের লেখাটি সুশ্রী। 'পরম প্রিয়' সম্ভাষণটি ওরই মধ্যে রমেন একবার চেখে নিল, তারপর চিঠিখানা পড়ে সে বলল, তুমি বুঝি গাড়ি চালাতে জান ফটিক ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকদিন ধরেই চালাই।

এ গাড়ি কার ?

আমাদেরই। এ গাড়ি ছিল কর্তা-মার।

রমেন বলল, যাচ্ছি বটে, তবে অনেক কাজ ছিল আমার এখানে।

খোপাটা হয়ত এসে ফিরেই যাবে। তাছাড়া হোটেলের বিলগুলো আজ চেক্‌ করব ভাবছিলুম। দেশে খান ছুই চিঠি লেখা দরকার। তা চলো, তুমি যখন এসেছ এতদূর থেকে। যাওয়া দরকার বইকি।

রমেন নিজেই গাড়িতে উঠে ফটিকের পাশে গুছিয়ে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল। জীপগাড়িতে রমেন এই প্রথম চড়ল। এটা মোটরকারও নয়, মোটরবাসও নয়—ছুয়ের মাঝামাঝি। হুস করে দম নেয়, চারচাকায় ছোটে, পথ ঘাটে একেবারে বেপরোয়া। ফটিক চালাতে জানে ভাল। ছু মিনিটের মধ্যেই স্টেশন ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ে সোজা তারা চলল রাণীগঞ্জের দিকে। মেরুদণ্ডবিহীন রমেনকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলল মায়াবিনী।

লাছুরাম দাঁড়িয়েছিল দোকানের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে আসতেই সে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, বাবুসাহেব সেহি যে ডুব মারলেন, আর দেখাশুনা হল না। সোবাই বলে হাপনার কোথা—সেই রাংগাবাবুঠো গেলো কোথায়। আস্থন বাবু, আস্থন—গরীব-খানায় পায়ের ধূলা ছাড়ুন।

রমেন হাসিমুখে উঠে এল রোয়াকের ওপর। লাছুরাম ওর হাত ধরে নিয়ে গদীতে ঢুকে মহাযত্নে ফরাসের ওপর বসাল। তারপর বলল, বাবু, আমরা ত চাল-ডাল-চানা বেচি। বড় বড় লোক হামার দোকানের খদ্দের। বাংগালি মহল্লায় যাকে জিগাবেন, সোবাই জানে হেই লাছুরামকে। চা খাবেন, বাবুসাহেব ? সোরবৎ ? হারা নারিয়েল ? কুছু না ?

ফটিক বোধ হয় উপরে গিয়ে খবরটা দিয়েছিল। সহসা রমেন মুখ ফিরিয়ে দেখল, স্বয়ং মূর্তিমান গোলক নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। সোজা ঘরে ঢুকে লাছুরামের দিকে মুখ খিঁচিয়ে সামন্ত বলল, তুমি আবার ওকে এখানে আটকালে কেন তাড়াতাড়ি কাজের

সময়। ওপরে ওদিকে রাগারাগি করছে—এসো ভাই রমেনদা—ওপরে উঠে এসো—আমাদের সৌভাগ্য তোমার পায়ের ধুলো পড়ল। এসো—

লাতুরাম বলল, বাঃ, বেশ কথা। 'পুণবান' আদমীর পায়ের ধূলা হামি বুঝি পাব না, সামন্ত ? আচ্ছা, যান্ বাবু যান্...

শোভা বোধহয় সিঁড়ির ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল। রমেন উপরে উঠে এসে নমস্কার বিনিময় করল। গোলক বলল, ঠাণ্ডা হয়ে বস রমেনবাবু, অনেক কথাবার্তা আছে। আমাদের কপাল ভাল বইকি, নইলে আমিই বা তোমার মতন সাধুসজ্জনকে চিনলুম কেমন করে ? আমিই একদিন ডেকে ঠাকরুণকে আড়াল থেকে দেখালুম—সে এই ধর, এক বছর হল। সেদিন থেকেই তুমি সোনার চক্ষে পড়ে গেলে।

শোভা হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ গো সামন্ত, হ্যাঁ। একশবার স্বীকার করছি তোমার বাহাদুরি। আসুন আপনি এই ঘরে—

একটি ঘরে এসে রমেন ঢুকল। এ ঘরটি সেদিনকার নয়, এটি অন্য। আসবাবপত্র পুরনো আমলের, কিন্তু মূল্যবান। মেঝেতে কার্পেট পাতা। দেওয়ালে টাঙান কয়েকটি তৈলচিত্র। আগেকার কালের নানা সরঞ্জাম এবং শৌখীন বিলাস বস্তু এখানে ওখানে সাজান।

একখানা গদি-আঁটা চেয়ারে রমেন এসে বসল। দরজার কাছে উবু হয়ে বসে গোলক বলল, আমি এসেছি এই ঘণ্টা দুই হল। সেই যে সেদিন রাত্রে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হল সেই থেকে আমার আর ঘুম নেই। তুমিই আমার চোখ খুলে দিলে দাদাভাই। ভাবলুম, তাই ত, এতটুকু মেয়ে---আমার মনিবের মেয়ে! যে-হাতে তাকে কোলে পিঠে করেছি, সেই হাতে কি ঠকাচ্ছি তাকে ? তার হিসেবের কড়ি তাকে বুঝিয়ে দিতে গিয়ে আমি যদি পথেই বসি, সেও ত ভাল।

শোভা সহাস্যে বলল, এমন কী সেদিন মন্তর দিলেন যে সামন্তর স্বভাব-চরিত্র বদলে গেল?

মুখ টিপে রমেন বলল, মহাভারতের ধর্মযুদ্ধের গল্পটা ওকে বলেছিলুম। পুণ্যবান লোক, তাই মন দিয়ে শুনেছিল।

গোলক এক গাল হাসল। বলল, না না, সে কি কথা, দাদাভাই তামাশা করছ। এমন মিষ্টি কথা শুনতে পাব বলেই ত আসবার সময় গরম গরম কাটলেট কখানা ভাজিয়ে এনেছি।

রমেন বলল, কাটলেট হজম হবে ত? না, সেদিনের মতন আবার ঝগড়ায় পড়ে যাব?

না না সে কি কথা? ওই ত ঠাকরুণ দাঁড়িয়ে---গোলক বলল, ওকেই জিজ্ঞেস কর ঝগড়া আর নেই। সেদিন ত তুমিই সব নিষ্পত্তি করে দিলে।

রাজু এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। শোভা এবার বলল, আসুন চা দিয়েছে খাবার ঘরে।

গোলক আগেই উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি নীচেই রইলুম লাতুরামের ওখানে। কথাটা আজ শুনে যাব ঠাকরুণ।

আচ্ছা বেশ, শুনেই যেয়ো---আসুন রমেনবাবু।

রমেন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার পাশ কাটিয়ে শোভার সঙ্গে খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। রাজু আগেই খাবার সাজিয়ে রেখেছে। ফলের প্লেট, মিষ্টান্ন, কাটলেট, ডিমের খাবার, একেবারে রাশি পরিমাণ। রমেন বলল, খেয়েই যাচ্ছি কেবল, কিন্তু খাওয়াবার কথা উঠছে না কেন?

হাসিমুখে শোভা বলল, চাকরি যখন বহাল রইল, এবার খাওয়ান একদিন।

সচকিত হয়ে রমেন প্রশ্ন করল, চাকরি বহাল রয়ে গেল, আপনি কেমন করে জানলেন?

গোলক কাল রাত্তিরেই খবর পেয়েছিল। আমি আজ সকালে জেনেছি। ও আমি জানতুম।—নিন বসুন—

খেতে বসে শোভা নিজেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল। বলল, আপনি কি সাংঘাতিক লোক বলুন ত? ওই বুনো ঘোড়াকে বশ করলেন মহাভারতের কোন্ গল্পটা দিয়ে?

রমেনের চোখে কৌতুক ঝলসে উঠল। বলল, সামন্তকে আপনি যত চতুর মনে করেন, ও কিন্তু তা নয়। আসলে সরল।

শুনুন তা হলে, বলি---শোভা হাত বাড়িয়ে রমেনের প্লেটের ওপর খাবার গুছিয়ে দিয়ে বলল, মঙ্গলবারদিন ভোরবেলায় সবে আমি ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় রাজু গিয়ে সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়ে এল সামন্তর গলার আওয়াজ পেয়ে। আমি বললুম, একি, এত ভোরে যে?---বাস, আর কোন কথা নেই, সোজা এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে উঠল। আপনার নাম করতেই আমি চুপ করে গেলুম।

তারপর?

আপনি খেতে আরম্ভ করুন।--- হ্যাঁ, তারপর গলগল করে সব বলে যেতে লাগল। ওর দোকানে যে এত কাণ্ড আছে, আমিই কি জানতুম? নিজেই সব স্বীকার করল। ও যে লাডুরামের দোকানে সব বেআইনী জিনিসপত্তর লুকিয়ে রাখে আমার কিছুই জানা ছিল না। আপনি ভীষণ কাণ্ড করেছেন দেখছি। কুবুদ্ধি ত আপনার কম নয়!

রমেন বলল, আমি কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ওকে ভয় দেখাতে আরম্ভ করেছিলুম। আমাকে যেন ভূতে পেয়ে বসল। ভয় ছিল পাছে আমার ধাপ্পা ধরা পড়ে। লোকটা কিন্তু আমার সব কথা বিশ্বাস করে নিলে। শুধু তাই নয়, এও ধরে নিলে আমার চেয়ে আপন ওর আর কেউ নেই। আপনি যে ফৌজদারি মামলা

করবেন, আর পুলিস এসে ওর কাজ-কারবার হিসেবপত্তর তচনচ করবে, এই ভয়েই ও কাঁপছে।

শোভা একেবারে হেসে লুটোপুটি। রাজু আবার এসে দু পেয়ালা চা টেবিলের উপর রেখে গেল।

ভোজ্যবস্তুর প্রাচুর্য দেখলে রুচি যায় কমে। কিন্তু যতটা পারা গেল, রমেন কার্পণ্য করল না। শোভার নিজের আহারের পরিমাণ সামান্য। ওরই মধ্যে কিছু কিছু সেও খেলো বইকি। এক সময় চায়ের বাটি টেনে নিয়ে রমেন বলল, আপনার এখানে আনা-গোনার মানে কি জানেন? আমার নিজের ঘরটার ওপর রুচি চলে যাচ্ছে। ওখানে আর মন টিকবে না।

শোভা বলল, আমার কি ভয় ছিল জানেন? যদি আপনি ঠিক সময় চিঠি না পান। এ পাঁচদিন আমি আড়ষ্ট হয়ে ছিলুম। কালকের রাতটা আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

রমেন বলল, একজন অজানা অনাত্মীয় মানুষের জন্যে আপনার এই উদ্বেগ কেন বলুন ত?

শোভা একটিবার রমেনের মুখের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, অজানা অনাত্মীয় মানুষকে কেউ ত রান্নাঘরে ডেকে আনে না।

রমেন সহজ ছিল—যতক্ষণ আলোচনাটা চলছিল বাইরের লোককে নিয়ে। কিন্তু এ যেন বাইরের পৃথিবী সম্পূর্ণ নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইল বাইরে। হঠাৎ যেন মুখোমুখি শুধু ওরা দু জন—মাঝখানে কেউ নেই, তৃতীয়পক্ষ অকস্মাৎ যেন অবলুপ্ত।

কথাটা সত্য, সোজা সে এসেছে রান্নাঘরে। মিথ্যে নয়, রমেন দেখে এসেছে—মেয়েদের সর্বাপেক্ষা চেনা মানুষ রান্নাঘরেই আসে। প্রণয়ের প্রশ্রয় ঘটে বৈঠকখানায়, ভালবাসার জন্য শয়নকক্ষ—কিন্তু এদের সীমানার বাইরে মেয়েদের একান্ত অন্তরঙ্গের ঠাঁই হল রান্না-

ঘর, কেননা মেয়ে সেখানে একা, আত্মার একান্ত দোসর ছাড়া অন্যের সেখানে ঠাঁই নেই।

রমেনের পা দু খানা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে সে বলল, আপনার চিঠিখানা পড়ে ফটিককে এলোমেলো কি যে বলতে গেলুম এখন আর মনে নেই। শুধু একটা কথা মনে ছিল, এ যেন আমার জীবনের প্রথম চিঠি। নিজের ভেতরেই যেন শুনতে পেলুম, বনের মধ্যে কোথায় একদল পাখি ডেকে উঠল। এ চিঠি লিখতে আপনার হাত কাঁপল না ?

রাজু কাছাকাছি ছিল না। শোভা বলল, এক বছর ধরে যাকে একটি দিনের জন্যেও মনের আড়ালে রাখি নি, তাকে প্রথম চিঠি দিতে মন যদি বা কাঁপে, হাত কাঁপবে কেন ? আপনাকে বাদ দিয়ে এই এক বছর নিজের কথা কিছু ভাবি নি।

রমেন বলল, আপনার সঙ্গে আমার কত তফাৎ, একি আপনার মনে হয় নি ?

তফাৎ ? কিসের ? - বড় বড় চোখে শোভা তাকাল।

রমেন বলল, সামাজিক জীবনে আপনার সঙ্গে আমার কি কোথাও মিল আছে ?

কিন্তু কোনও কথার জবাব দেবার আগে ফটিক এসে দাঁড়াল। বলল, এখন সাড়ে চারটে। আপনি মনে করিয়ে দিতে বলেছিলেন।

শোভা বলল, হ্যাঁ, এই উঠি। চলো—

রমেন বলল, আমিও এবার যাব। ট্রেন কি পাব এখন ?

অবাক করলেন আপনি।—হাসিমুখে শোভা বলল, কে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছে ? আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

কোথায় ?

চলুন না, বেড়িয়ে আসি আমার ছাত্রীদের ওখানে। তারা বিশেষ করে বলে রেখেছে। আপনারও নেমন্তন্ন।

রমেন বলল, কই, চিঠি ত পাই নি ?

শোভা বলল, চিঠি অবিশ্যি নেই। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে কোথাও গিয়ে খেলো হবেন, সে-জায়গায় আপনাকে আমি নিয়ে যাব কেন ? একটুও ভাববেন না, চলুন আমার সঙ্গে।

রমেন উঠে বাইরের ঘরের দিকে গেল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই শোভা বেরিয়ে এল। পরনে পরিচ্ছন্ন একখানি সুতি-শাড়ি, গায়ে সাদামাটা একটা জামা। পায়ে একজোড়া চটি। পিছন থেকে রাজু ডাকল, দিদি ?

শোভা মুখ ফিরিয়ে বলল, হ্যাঁ রাজু, দু জনের জন্যেই রেঁধো। চলুন—

নীচে নেমে এল দুজনে। সামন্ত দাঁড়িয়েছিল লাড়ুরামের পাশে। বুঝতে পারা গেল লাড়ুরামের সঙ্গে শোভার বাক্যালাপ একপ্রকার বন্ধ। সামন্ত সাগ্রহে বলল, কথাবার্তা কি এখন তবে মুলতুবি থাকবে ?

থমকে দাঁড়াল শোভা। তারপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ব্যাপারটা যে রকম তোমরা দুজনে পাকিয়ে তুলেছ শুনলুম, তাতে দুজনের মধ্যে কার বিপদ বেশি আমি জানি নে, সামন্ত। এখানকার উকিলকে আর আমার বিশ্বাস নেই। সামনের সপ্তাহে কি করা যায়, সবাই মিলে ভেবে দেখতে হবে।

লাড়ুরামের মুখখানা বিমর্ষ হয়ে রইল। সামন্ত বলল, আমি কি আসব এর মধ্যে ?

না। শোভা গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আগে রমেনকে গাড়িতে তুলল। তারপর নিজে উঠে বসল তার পাশে। ফটিক গাড়ি ছেড়ে দিল।

লাড়ুরাম বলল, মেয়ে-আওরৎ আশনাই করবে কুছু লোকসান নেই, সামন্ত। লেকিন তুমি গধ্ধা আছে, তাই খাল কাটিয়ে

কুম্ভীর আনিয়ে হাজির করলে। ওই বাবু হামাদেরকে পথে বসাবে, দেখো।

থাম্ লাছু, গজর গজর করিস নে। তুই চাল বেচে খাস, আমি সেই চাল ফুটিয়ে খাওয়াই—ভারি ব্যবসা শেখাতে এসেছিস! শুধু বসে থাক, দেখবি চাকা আবার এদিকে ঘুরবে।

সেই চাকায় তুমিও ঘুরবে চরকীর মতন, সামন্ত।

থাম্—সামন্ত আবার ধমক দিল—মুরুব্বিয়ানা করিস নে। আশনাইটে কোথায় গিয়ে গড়ায় আমিও বুঝব।

রোয়াক থেকে নেমে সামন্ত হন হন করে চলল স্টেশনের দিকে।

আসল ব্যাপারটা ফটিক জানে না, এবং তাকে জানানটাও বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু বড় রাস্তায় পড়ে গাড়ি যখন একদিকে ছুটল, শোভা তখন হেসে কুটোকুটি করতে লাগল। তারপর এক সময় বলল, ওষুধ এবার ঠিকই পড়েছে! রাজু, ফটিক—এরা পুরনো লোক, এরা সবাই ওকে হাড়ে হাড়ে জানে।

ফটিক বলল, বাবু, লোকটা ভয়ানক শয়তান, এ তল্লাটে এমন লোক নেই যে ওকে চেনে না। কর্তা-মার কাজ কর্ম করত বলেই ওকে কেউ কিছু বলত না!

রমেন বলল, ও কি লোককে ঠকায়, ফটিক?

ফটিক বলল, পাঁচ জনকে না ঠকালে কি কারবারের উন্নতি হয়, বাবু?

রমেন চুপ করে গেল।

শোভা বলল, ফটিক, আমাদের টাইম্ ত ছটায়। চল না কেন বেদেডোবার ওদিকে—সময় হবে না?

ফটিক বলল, তাহলে দুর্গাপুরের রাস্তায় যেতে হয়। ওখানে গিয়ে কি বসবেন একটু?

একটু ঘুরে আসব। ঘণ্টাখানেকে হবে না?

হবে, চলুন—

ফটিক এক জায়গায় থামিয়ে গাড়িখানা ঘুরিয়ে নিল। শোভা বলল, এদিকে আপনি আসেন নি, আমার কিন্তু সব চেনা।

রমেন বলল, আপিস ছাড়া আমি আর কিছু জেনেছি কি? এই আজই ত প্রথম।

শোভা বলল, চার পাঁচ বছরের মধ্যে এদিকের সব চেহারা বদলে গেল। এর পরে আরও চেনা যাবে না। কলকারখানাও বাড়ছে, ছোট ছোট শহরও বসে যাচ্ছে।

কিছুদূর গিয়ে গাড়িখানা ডান দিকে বাঁক নিল। ফুরফুরিয়ে হাওয়া দিয়েছে বাইরে, সে-হাওয়া লাগছে ওদেরও মুখেচোখে। জীপগাড়ির পিছনের সীটে তুজনের ঠিক আঁটে না, কিন্তু বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হলে অসুবিধাও হয় না। এক সময় মুখ ফিরিয়ে শোভা রমেনের দিকে তাকাল। মৃত্নু গলায় প্রশ্ন করল, ভাল লাগছে না?

রমেন যেন তন্দ্রার মধ্যে ছিল, সেই নিবিড় চক্ষু নিয়ে শোভার দিকে ফিরে শুধু হাসল, এবং তার হাতখানা শুধু এগিয়ে এল শোভার হাতের ওপর। এর পরে আর কিছু বলার রইল না।

ভাল লাগছিল দূর থেকে দূরান্তরের পথ। মাঝে মাঝে এক এক ঝলক রৌদ্রসিক্ত বনগন্ধ আসছে হাওয়ায় হাওয়ায়। রৌদ্র এখনও রাঙা হয় নি। রমেনের বসার ভঙ্গীতে কোথায় যেন এসেছে একটি শিথিলতা। সেটি হয়ত একমাত্র স্পর্শের আবেশ নয়, কিন্তু সাহচর্যের মাধুর্য—যেটি তার জীবনে প্রথম।

এক সময় সে বলল, এ এক নতুন জগৎ। ট্রেনে এলে এর কিছুই দেখা যেতো না। আপনার গাড়িখানা পাওয়া গেল বলেই দেখার সুবিধে হল।

মিষ্ট মৃত্নুকণ্ঠে শোভা বলল, গাড়ি আমার নয়।

আপনার নয়? তবে কার?

কানের কাছে শোভা মুখ সরিয়ে আনল, তারপর—ফটিক না শুনতে পায়—মিহি মধুর কণ্ঠে বলল, আপনার।

হেসে উঠল রমেন। বলল, মিথ্যে, কিন্তু শুনতে মিষ্টি।

শালের জঙ্গলে একটা অংশ পেরিয়ে দেখতে দেখতে গাড়ি এক জায়গায় এসে থামল। আগে নামল শোভা, পরে নেমে এল রমেন। ফটিক বলল, গাড়ি কি এখানে থাকবে, না আপনারা বাড়িতে যাবেন?

শোভা বলল, না, আজ নয় ফটিক, অন্যদিন আসব। বাড়িতে ঢুকলে আজ দেরি হয়ে যাবে। তুই এক কাজ কর ফটিক, তালতলার ওদিক দিয়ে গাড়ি নিয়ে যা—বাঁধের কাছে রাখিস, আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাব। মালীকে একবার পাঠিয়ে দিস।

আচ্ছা—বলে ফটিক গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

রমেন বলল, এরই নাম বেদেডোবা? জঙ্গলটা থাকার জন্য জায়গাটা ভারি সুন্দর হয়েছে। কারোকে দেখছি নে কোথাও! ওই যে দেখছি, ও বাড়িটা কি আপনাদের?

শোভা বলল, বাবা এই জায়গাটাই বেছে নিয়েছিলেন। এ বাড়িটা পুরনো, কিন্তু এর পুরনো ইতিহাস অনেক। ওই যে দেখছেন দূরে কখানা চালাঘর, ওখানে মালীরা থাকে। রাত্রে দুজন বাড়িতে এসে শোয়।

দিঘিটা কাদের?

আমাদেরই। একখানা ছোট নৌকো আছে, একদিন আপনাকে চড়াতে পারি।—শোভা চলতে চলতে বলল, ওদের উৎপাতে মন খারাপ হলে মাঝে মাঝে এখানে চলে আসি। এ জায়গাটার ওপর সরকারি লোকদের কিন্তু নজর আছে। মা থাকতে ওরা খুব ধরাধরি করেছিল। মা ছিলেন খুব শক্ত।

দিঘির ধারের দিকে ওরা হাঁটতে হাঁটতে এল। অদূরে একটি

বসবার আসন তৈরি করা ছিল—ইঁট আর সিমেণ্টের গাঁথুনি দিয়ে। সেখানে ওরা বসল না, হাঁটতেই লাগল। এক সময় শোভা পুনরায় বলল, আপনাকে কিন্তু আমি সত্যিই বলছি, আমার দ্বারা এসব দেখাশোনা কিছুতেই আর হয়ে উঠছে না—আমি এমন বিপদে পড়ে গেছি, কি বলব।

থমকে দাঁড়াল রমেন। বলল, আপনি কি আমাকে সেক্রেটারী করবেন ভাবছেন?

বোধহয় তার গলার আওয়াজে উগ্রতার আভাস ছিল, শোভা বড় বড় চোখে তার দিকে তাকাল। পরে বলল, না, না, আপনি তবে ভুল বুঝেছেন। এসব মতলব আমার নেই।

কিন্তু প্রথম দিন আপনি আমার সাহায্যের কথা তুলেছিলেন, মনে আছে?

খুব মনে আছে। সেটা সাহায্যের কথা। যেমন সাহায্য আপনি করছেন সামন্তর ব্যাপারে। আমি কেবল বলছিলুম এসব আমি পেরে উঠি নে, এসব আমার জানাও নেই।

রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। তারপর বলল, ভাগ্যচক্রান্ত আপনাকে এর মধ্যে এনে ফেলেছে। মাঝে মাঝে আমি শুধু আপনাকে বলে দিতে পারি, কি কি করা আপনার পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু তার আয়ুও অল্প। দুমাস পরে চাকরি গেলে আমাকে চলেই যেতে হবে।

শোভা বলল, আপনি কেবল যাবার কথাটাই ভাবছেন। এখানে থেকে ভাল একটা কারবার করুন না কেন!

বাঃ, বেশ বলেছেন!—রমেন হাসিমুখে বলল, অর্থাৎ, দ্বিতীয় গোলক সামন্ত হতে বলছেন। আপনার মায়ের টাকায় গোলক ভাগ্য ফিরিয়েছে, এবার আপনার টাকা নিয়ে আমি ভাগ্য ফেরাব। আমি আর গোলক, গোলক আর আমি।

দিঘির পাড় ধরে হাঁটছিল। শোভা তার কথা শুনে হেসে উঠল। বলল, যতই নিজের তুলনা করুন গোলকের সঙ্গে, আমি রাগ করব না। আপনি কি, তা আমি জানি। বেশ ত, আমাকে বলে দিন, কি করলে এসব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচব?

রমেন বলল, হ্যাঁ, তা বলতে পারি। পাঁচজন গরীব ব্রাহ্মণকে যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

বিবাগী আবার কি?

সন্নিসি হয়ে যাওয়া।

তা হতে যাব কেন? কোন্ দুঃখে? আপনি দেখছি সর্বনেশে পরামর্শদাতা।

রমেন খুব হেসে উঠল। তারপর দূরের দিকে চেয়ে এক সময় বলল, ওটা কি, ওই যে গোল গম্বুজের মতন?

শোভা বলল, ওঃ ওটা দেখলে আমার বড্ড মন খারাপ হয়। মা ওটাকে মন্দির তৈরি করছিলেন, কিন্তু শেষ হবার আগেই মারা গেলেন। সেই থেকে অমনিই পড়ে আছে।

এবারে রমেন কথাটা পাড়বার সুবিধে পেয়ে গেল। বলল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।

বেশ ত, বলুন না?

আপনার মা-বাবার গল্প খানিকটা সামন্ত আমাকে বলেছে। তার দুএকটা কথা ঠিক আমার বিশ্বাস হয় নি। আপনাদের পরিবারে কোনও অসামাজিক ঘটনা কিছু ঘটেছিল?

শোভা একটু সময় নিল। পরে বলল, আপনি কি মা-র কথা জিজ্ঞেস করছেন?

হ্যাঁ—

সামন্ত সবই জানে, আমি জানি সামান্য। তবে সে এক ভারি মজার ব্যাপার। আমার দিদিমার নাম ছিল বুড়িবিবি, তিনি খুব

নাকি নাচ গান—এই সব করতে পারতেন। চারদিকে তাঁর নাম ডাক ছিল, বহু টাকাও রোজগার করেছিলেন। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে, তিনিই আমার মা।

রমেন বলল, কিন্তু মজার ব্যাপারটা কি হল?

হেসে উঠল শোভা। বলল, বাবা যখন বুড়িবিবির মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলেন, বুড়িবিবি বেঁকে বসলেন। বললেন, ডাকাতে-মুখুজ্যেদের ঘরে তিনি মেয়ে দেবেন না। তারপর বাবা একদিন মাকে নিয়ে কোথায় যেন চলে যান। গান্ধর্বমতে ওঁরা ঘরকন্না পাতেন। গান্ধর্বমত কি তা কিন্তু আমি জানি নে, কথাটা শুধু শুনেই এসেছি এতদিন।

আমরা যাকে বিয়ে বলি তা হয় নি বলছেন?

ওটা সামন্ত জানে। বোধহয়, ঠিক সেভাবে হয় নি।

এমন সরল স্বীকারোক্তি শুনে রমেন একটু অবাকই হল। বলল, এর জন্যে সামাজিক নিন্দে হয় নি আপনার মা-বাবার?

শোভা বলল, তা কেন হবে? যারা ভয় পায় তাদেরই নিন্দে হয়। তাছাড়া দুচারদিন বাদে ওসব লোকে ভুলেও যায়। আপনি বুঝি এসব নিয়ে খুব মাথা ঘামান?

রমেন বলল, আপনার দিদিমার কোনও পরিচয় জানেন না?

কেমন করে জানব? সে ত পুরনো কালের কথা। আপনার দিদিমা, কি তাঁর মা—এঁদের অল্পবয়সের সব কাহিনী কি আপনি জানেন? এক কালের ঘটনা, আরেক কালের গল্প।

আপনার নিজের মনে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই?

শোভা তাকাল রমেনের দিকে। বলল, কিসের প্রতিক্রিয়া? আপনার কথা বুঝতে পারছি নে।

রমেন চুপ করে গেল, কথা বাড়াল না। সমাজনীতি সম্বন্ধে বোধ যেখানে জন্মাতে পারে নি, সেখানে কলুষের স্পর্শও নেই। কলঙ্ক

তখনই সত্য, কলঙ্ক যেখানে স্বীকৃত। বিবাহের মধ্যে যেখানে নৈতিক বন্ধনের কথা আছে, সেটা পাকা কি না এইটিই আসল কথা।

শোভা হঠাৎ হাসল। আপনি একটু পুরনো ধরনের মানুষ, তাই না? যেটা দেখা অভ্যেস, সেটা দেখতে না পেলেই আপনার মন খুঁৎ খুঁৎ করে।

রমেন বলল, খুব সম্ভব আপনার কথাই সত্যি।

মৃদু শান্ত কণ্ঠে শোভা বলল, সব ভেঙ্গে পড়ছে, ভাল করে চেয়ে দেখুন। মন ভাঙছে চারদিকে, পুরনো বিশ্বাসও ভাঙছে। যদি পিছিয়ে থাকেন, আপনিই হা-হুতাশ করবেন, আপনার দিকে কেউ ফিরেও চাইবে না। ভালটাই যে ভাল, তাই বা কে বললে? এর পর অনেক নতুন ভাল আসছে, তার জন্যে যদি এখন থেকে জায়গা করে না রাখেন, তাহলে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে তারা এসে জায়গা জুড়ে বসবে। যতটুকু পারেন এগিয়ে আসুন, পিছিয়ে পড়ে থাকলে এর পর পথ চিনতে পারবেন না।

রমেনের পা যেন একটু কাঁপছিল। মেয়েটা আঘাত করছে যেন মূল অস্তিত্বের গোড়ায় মস্ত কুঠার দিয়ে। মেয়েদের দায়িত্ব কম, ভাঙতে তাদের আটকায় না। কোনও কালের পুরনো ব্যবস্থা আঁকড়ে মেয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। ভাঙে তারাই—পুরুষ হল তাদের হাতিয়ার। ঘর ভেঙে দিচ্ছে মেয়ে—যে-ঘর তাদের পছন্দ নয়। যৌথ-পরিবার ভেঙে দিল মেয়ে, কেন না সেখানে তাদের স্বাধীনতা কম। প্রাণের তাড়ায় তারা ছুটছে, সেইজন্য নির্জীব পুরুষ তাদের দুচোখের বিষ। কতকগুলো কথা এমনি করে রমেনকে পেয়ে বসল।

ওই যে মালী আসছে এবার। আসুন এগিয়ে যাই—আপনি নিশ্চয় আমাকে মনে মনে গাল দিচ্ছেন?

ব্যস্ত হয়ে রমেন বলল, না না, সে কি কথা? আপনার ওই কথাগুলোই মনে মনে তোলাপাড় করছি। চলুন—

সায়াহ্নকাল নেমে আসছিল। জঙ্গলের দিকটায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্ত হচ্ছে। দূর থেকে মালী আসছিল ছুটতে ছুটতে। কাছে এসে সে নমস্কার জানাল। শোভা বলল, চন্দর, কাল আমরা সকালের দিকে আসব। তোমাকে তাই বলতে এলুম।

রান্নাবান্না হবে কি মা?—হাত জোড় করে চন্দর সামনে দাঁড়াল।

হবে বইকি। আমি ভোরবেলায় রাজু আর ফটিককে এখানে পাঠিয়ে দেব। রাজুই রান্নাবান্না করবে।

যে আজ্ঞে।

মাছ পাবে পুকুরে?—শোভা জানতে চাইল। চন্দর সোৎসাহে বলে উঠল, আজ্ঞে হ্যাঁ, পাব বইকি। গেল বছর অত চারা ফেলা হয়েছিল।

বেশ, তাহলে এখন আমরা চললুম। আসুন রমেন বাবু—

জীপগাড়ির পক্ষে পথ বেশি দূর নয়। কিন্তু এরই মধ্যে কেমন করে যেন একপ্রকার শঙ্কা রমেনকে পেয়ে বসেছিল। মুঠি যেন তার কোথায় শিথিল হচ্ছে, ঢেউ এসে যেন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যেদিকে কূলকিনারার সন্ধান নেই। সামলাবে সে কোন্ দিকটা, ঠিক পাচ্ছে না। আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে তার নিজের জানা-জগতের খুঁটি, কিন্তু তার তলা যাচ্ছে ক্ষয়ে। বিচার করে দেখবার, বিশ্লেষণ করে জানবার সময় সে পাচ্ছে না। শ্রদ্ধাসহকারে যে ধারণা সে এতকাল লালন করে এসেছে, এ মেয়েটি যেন সেটাকে এক কথায় হেসে উড়িয়ে দিল।

হুজুগে মেয়ে! সংশয়াচ্ছন্ন চোখে রমেন মুখ ফিরিয়ে এক বার পার্শ্ববর্তিনীর দিকে তাকাল। মৃদু হাস্যে শোভা বলল, বলবেন কিছু? হুকুম করুন। বড্ড গম্ভীর মানুষ আপনি।

গলা নামিয়ে রমেন বলল, আমি কি তা জানি নে, আবার ঠিক বুঝতেও পাচ্ছি নে। হয়ত আমিই সব গুলিয়ে ফেলছি।

আমার কথায় রাগ করছেন বুঝি?

না, তাও না। বরং এমন করে কান পেতে আর কোন দিন কারো কথা শুনি নি। হঠাৎ আলোর ঝলকে বোধহয় চোখে ধাঁধাঁ লেগে যাচ্ছে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ—কোনটার খেই ধরতে পাচ্ছি নে।—রমেন বলতে লাগল, কাল ছিলুম অত্যন্ত গরীব, আজ মনে হচ্ছে মস্ত ধনী—শুধু এই সৌভাগ্যের চাপে দম আটকে আসবে কিনা তাই ভাবছি।

শোভা হেসে উঠল। তারপর এক সময় হাসি থামিয়ে সে বলল, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন—বাইরের হাওয়া আরও আপনার গায়ে লাগুক।

রমেন বলল—হাসিমুখেই বলল, আপনার সঙ্গে মধ্যে মাঝে দেখা হলে হয়ত সে-হাওয়া লাগবে।

'মধ্যে-মাঝে' কথাটা শুনে শোভা হঠাৎ চুপ করে গেল। হয়ত বা সে একটু আঘাতই পেয়ে থাকবে। কিন্তু আঘাত যেখান থেকে এল সে-ব্যক্তি নিজের মধ্যেই তলিয়ে রয়েছে। একবার ভ্রূক্ষেপও করল না, এই সামান্য কথাটি কোথায় গিয়ে বাজল। শোভার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল।

দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পৌঁছে গেল রাণীগঞ্জ শহরের কেন্দ্র থেকে একটু দূরে। এটি স্কুল। সামনে আলো দিয়ে সাজান হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মেয়ে শোভার জন্যই বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। শোভা নেমে এল গাড়ি থেকে হাসিমুখে। রমেন নামতেই তিন চারটি মেয়ে এগিয়ে এসে অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনাকে আমরা আনতে পারব আশা করি নি, তাই শোভাদিকে আমরা ধরেছিলুম। দয়া করে আপনি পায়ের ধুলো

দিলেন, এই আমাদের সৌভাগ্য। আসুন, আজ আমাদের স্কুলের পুরস্কার-বিতরণের সভা। পুরস্কারের পালাটা হয়ে গেছে, এখন একটু গান-বাজনা হবে।

শোভাকে নিয়ে কয়েকজন আগে আগে চলল, এবং মেয়েরা বিশেষ অভ্যর্থনা জানিয়ে রমেনকে সভাস্থলে নিয়ে গেল। রমেন এতক্ষণ একটা উদ্দাম অবাস্তব জগতে কোথায় যেন তরঙ্গে-তরঙ্গে আহত-প্রতিহত হচ্ছিল, এবার নেমে এল প্রত্যক্ষ রূঢ় বাস্তবলোকে। চারদিকের অত্যুগ্র আলোয় আর কোলাহলের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে স্বপ্নটা গেল ছিন্নভিন্ন হয়ে।

কিন্তু আজকের এ দৃশ্যটা নতুন। গান-বাজনা শেখা বা জানা এক জিনিস, ছাত্রীদেরকে গান-বাজনা শেখানোও এক জিনিস, আর শোভার উপস্থিতিমাত্র সমগ্র হল-এ সম্মিলিত রাণীগঞ্জের জনসাধারণের উল্লাস ও করতালিধ্বনি—এ চেহারা ভিন্নপ্রকার। বলা বাহুল্য, শ্রোতৃসাধারণ এতক্ষণ উদগ্রীব হয়ে শোভারই জন্য অপেক্ষা করছিল—এবং মিনিট পনেরো দেরি হওয়ার জন্য যে অধীরতা বেড়ে গিয়েছিল—তার প্রকাশটাও দেখা গেল ওই হাততালিতে। এমন সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা নিজের চক্ষে না দেখলে রমেন বিশ্বাস করত না।

ভিড়ের ভিতর দিয়ে হল-এ এনে মেয়েরা তাকে বসিয়েছে সবচেয়ে ভাল জায়গাটিতে মঞ্চের নীচে, কিন্তু বৃহৎ জনতার মধ্যে সে যে কোথায় হারিয়ে গেল কেউ খোঁজও রাখল না। কেবল মঞ্চের উপরে উঠে সকলের উদ্দেশ্যে সহাস্যে একবার নমস্কার জানিয়ে শোভা বসবার ঠিক আগে রমেনকে একবার দেখে নিল। বিদ্যুদ্দামের ক্ষণস্থায়ীত্বের মতো উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল। শোভা মিষ্ট হাসল শুধু।

সভানেত্রী ছিলেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী—বয়স্বিনী এক মহিলা। কৃষ্ণবর্ণা, গলায় মফ-চেন, সোনার ফ্রেমের চশমা চোখে, হাতে একটি রিস্টওয়াচ, ডান হাতে চিকচিকে একগাছি চুড়ি। পরণে গোলাপী

রঙের একখানি 'ধনেখালি'। কণ্ঠস্বর একটু পুরুষোচিত। তাঁর প্রাক্তন ছাত্রীর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট শ্রীমতী শোভা মুখার্জিকে আজ পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে একটি মানপত্র এবং স্বর্ণপদক দেওয়া হচ্ছে। স্বর্ণপদকটি স্কুলের পক্ষ থেকে দেওয়ার কারণ হল, সম্প্রতি শ্রীমতী শোভা 'সঙ্গীত-ভারতী' পদবীটি লাভ করেছেন। আজ সমগ্র রাণীগঞ্জ শহরের মহিলা-সমাজ তার গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করছেন।

অভিনন্দনের কাগজটি পাঠ করার পর দুটি মেয়ে একে একে এসে গান গেয়ে গেল। একটি মেয়ে আবৃত্তি করল, এবং আরেকটি এগিয়ে এসে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রীমতী শোভা দেবীকে অভিনন্দন জানাল।

রমেন ভাবল, এসব দেখিয়ে কি তাকে অভিভূত করা হচ্ছে? কিন্তু সকলের সঙ্গে নিজের হাততালি যোগ না করাটাও একটু বেমানান। আশপাশের লোকেরা এটি লক্ষ্যও করে। বিশেষ করে সে এসেছে শোভার সঙ্গে—দেখেছে অনেকেই। রমেন অতি ধীরে ধীরে একবার একটু হাততালি দিল বটে, কিন্তু শোভা বসেছিল নতমুখে সবিনয়ে। সংশয়বাদী রমেন তাকিয়েছিল শোভার দিকে—সেখানে ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় কিনা। এমন স্পষ্ট করে শোভাকে আর কোনদিন সে দেখে নি। পুরুষের সমস্ত প্রলোভনের উপকরণ শোভার সর্বাঙ্গে থরে থরে সাজান—বিধাতা কার্পণ্য করেন নি কোথাও। কিন্তু রমেন তাকিয়েছিল সেই সেকালের নর্তকী এবং বারবিলাসিনী বুড়িবিবির দিকে—ইতিহাস যার সম্পূর্ণ মুছে গেছে। রমেন দেখছিল ডাকাতে-বোকেন মুখুজ্যের সহচারিণী পিতৃপরিচয়হীনা সিন্ধুবালাকে—সামাজিক জীবনে যাদের অবৈধ মিলনটি শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। দেখছিল সে শোভা মুখার্জিকে—যার খ্যাতি এবং কৃতিত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত।

জন্মের ইতিবৃত্ত নিয়ে একালে মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ—ওটা হল দৈবাৎ, ওটার অবশ্যম্ভাবীত্ব লোকে মেনে নিয়েছে। অবৈধ প্রণয়-জাত সন্তান আপন কর্মের জন্যই দায়ী হচ্ছে, জন্মের জন্য নয়। কলঙ্কের সংবাদকে আর কেউ সযত্নে লালন করছে না, নতুন কালের হাওয়ায় ওটার রঙ যাচ্ছে ফিকে হয়ে। বারবনিতার একান্ত প্রণয়-কাহিনীর ব্যর্থতার কথা শুনে শ্রোতার চোখে যদি জল আসে, তা হলে একথা বুঝতে হবে যৌনশৈথিল্যটা বড় নয়—চরিত্রের অন্য-দিকটায় বড় রকমের একটা গৌরব আছে, যেটি হৃদয়মাধুর্যে সিক্ত। মানুষের শেষ বিচারবোধ বোধহয় এইটিরই মূল্য দেয়।

একজন শিক্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন। উনি নাকি অনেকদিন আগে থেকে শোভা মুখার্জির প্রতিভার আভাস পেয়েছিলেন। তা হবে। কিন্তু খামকা রমেনকে ধরে এনে এমন-ভাবে শোনান হচ্ছে, যেন সে একটু প্রসন্নচিত্ত হয়। সে চাকরি করে স্টোরে, একশ দশটাকা তার মাইনে, ছেঁড়া শতরঞ্চি পেতে সে শোয়, পাইস-হোটেলে খেয়ে তার দিন কাটে, তিনকূলে তার আপন বলতে কেউ নেই, রাণীগঞ্জের স্কুলের সঙ্গে এ জীবনেও তার কোনও যোগ নেই—এ প্রবন্ধ তাকে নাই বা শোনান হল।

অবশেষে প্রবন্ধ শেষ হল, অথবা শ্রোতারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল একথা বলা কঠিন। কিন্তু বুঝতে পারা গেল, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া প্রবন্ধটির এতখানি দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে একটু বিরক্ত হচ্ছিলেন। সেই কারণে ওটি শেষ হতে না হতে তিনিই প্রথম হাততালি দিয়ে উঠলেন।

এমন সময় কে যেন ঘোষণা করল, এবার শোভা দেবী গান গাইবেন। বটে, রমেন ঈষৎ সজাগ হয়ে বসল। সমস্তটাই ত সাজান, পূর্ব-পরিকল্পিত। এর মধ্যে কোনও চোরা-ব্যবসায়ী এসে দাঁড়িয়ে পদক দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন না, এটা আশ্চর্য।

শোভা দেবী গুছিয়ে এবার বসলেন। দুটি ভদ্রলোক এসে বসলেন দুপাশে, আরেকজন বসলেন একটু দূরে হারমোনিয়ম নিয়ে। ভদ্রলোকদের একজনের কাছে তম্বুরা, অন্যজনের কাছে বাঁয়া-তবলা।

তম্বুরা থেমে রইল, হারমোনিয়মে মৃদু মিহি সুর চড়লো। গান ধরলেন শোভা দেবী। রমেন এই প্রথম শুনল শোভার কণ্ঠস্বর।

সংশয়-সংস্কার-আচ্ছন্ন রমেনের চোখ দুটো স্তব্ধ হয়ে রইল। গত একমাস ধরে যাকে একান্ত করে দেখা হচ্ছিল, এ গায়িকা সে নয়। সামন্ত আর লাতুরামকে নিয়ে যার উদ্বেগ ও অশান্তির অন্ত নেই, ডাল-ভাতের হিসেব এবং হোটেলের কার্যবিধি যার নিত্যদিনের ঔৎসুক্য—না, এ মেয়ে সে নয়, এ অন্য। একে দেখা হয় নি গত একমাসের মধ্যে। এ মেয়ে নেমে আসে নি সেই রস-কল্পনার জগত থেকে—ধুলিধূসর পৃথিবীতে এর পা স্পর্শ করে নি কোনদিন। এ মেয়ে অনাবিষ্কৃত ছিল।

বুড়িবিবি পুরনো ইতিহাসের অতল বিস্মৃতির তলায় মিলিয়ে গেল। সিন্ধুবালার অবৈধ জীবনযাত্রা হারাল কোন্ অতীতলোকে। এমন কি ডাকাতে-বোকেন মুখুজ্যে তার সমস্ত বিলাস বৈভব নিয়ে মুছে গেল স্মৃতির পট থেকে। বাস্তবিকই শোভাকে আজকে যেন আর চিনতে পারা যাচ্ছে না।

গানের পর গান হল – রমেন বসে রইল বিমূঢ় একটা স্থাণু পিণ্ডের মতো। হাততালি পড়েছে কতবার, সে বোধকরি শুনতে পায় নি। সাধুবাদ দিয়েছে রসিক শ্রোতারা, সে কিন্তু নিঃসাড়ে বসে ছিল। জানা জগত থেকে অজানা শূন্যলোকে কেউ যেন তাকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে, পিছনের নিষ্প্রাণ দেহটা তার স্তব্ধ হয়ে রয়েছে চেয়ারখানার ওপর।

গান থেমেছে, সভানেত্রীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দানের পালা কখন শেষ হয়েছে, এবং শিল্পীরা একে একে নমস্কার জানিয়ে চলে

গেছে—এসব যন্ত্রচালিত ব্যাপারগুলো ঘটবার সময় রমেনের হুঁশ ছিল না। কিন্তু শেষের দিককার মীরার ভজনটি শোনবার কালে মীরার ছিন্ন হৃৎপিণ্ড থেকে যে রক্তের ধারা সমগ্র ভজনটিকে রক্তাপ্লুত করেছিল, সেই রক্তের দুই ফোঁটা একশ দশটাকা মাইনের কনিষ্ঠ কেরানীর ভাবাপ্লুত দুই চক্ষে টলটল করছিল অনেকক্ষণ। এমন সময় দুটি মেয়ে কাছে এসে বলল, আপনার গাড়ি তৈরি, শোভাদি অপেক্ষা করছেন বাইরে।

ও, হ্যাঁ—চলো।—রমেন গা ঝাড়া দিয়ে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সবাই চলে গেছে দেখছি, চলো, চলো—

গাড়ির মধ্যে শোভা বসেছিল। রমেন উঠে গিয়ে পাশে বসল। অনেকগুলি মেয়ে নমস্কার জানাবে বলে ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। এবার আস্তে আস্তে ফটিক গাড়ি ছেড়ে দিল।

তার এই অটল এবং নির্বাক গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে এক সময় শোভা প্রশ্ন করল, চুপ করে যে? শরীর খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ—

আমি জানতুম।—শোভা ব্যস্ত হয়ে উঠল, অত গুমোটে শরীর কখনও ভাল থাকে?—ফটিক, শিগগির চলো—

রমেন চোখ বুজে চুপ করে রইল। না, এ মেয়ে ত সেই গায়িকা নয়। এ হল স্নেহে করুণায় বেদনায় সেবায় দয়ায় দাক্ষিণ্যে—সেই চিরকেলে বাঙালীর মেয়ে, একালে যাদের পুরনো পুঁজি গিয়েছে ফুরিয়ে। এ মেয়েকে রমেন ভুলেছিল।

শোভা অধীর কণ্ঠে বলল, ডাক্তারকে একবারটি খবর পাঠাই, কেমন?

রমেন চুপ করে রইল। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। উৎকণ্ঠিত শোভা বলল, ফটিক, আগে বাড়িতে চল্—খিড়কির কাছে গাড়ি রাখবি চল্—সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাব।

যে আজ্ঞে।— ফটিক সন্তর্পণে গাড়ি নিয়ে চলল এবং শোভা রমেনের একখানা ঠাণ্ডা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে অধীর উৎকণ্ঠায় বসে রইল। হবেই ত—যত্ন নেই, সেবা নেই, আপন বলতে দেখবার কেউ নেই। বাসাড়ে জীবন যাপন করা, আর দুবেলা দুমুঠো নাকে মুখে গুঁজে আপিস ছোটা। শরীরের এ দশা ত হবেই। বাইরের স্বাস্থ্য আর চেহারাটাই সবাই দেখে— মানুষটার ভিতরটা যে একেবারে ফোঁপরা। জানে কেউ, না কেউ খোঁজ রাখে?

গাড়িখানা এসে লাছুরামের দোকানের পাশ দিয়ে ঘুরে ছোট দরজার কাছে থামল। শোভা নিজে নামল আগে, তারপর অতি যত্নে হাত বাড়িয়ে রমেনকে ধরে নামিয়ে নিল। একবার মুখ ফিরিয়ে বলল, ফটিক গাড়িখানা এখানেই থাক্ এখন। আমি আগে এঁকে ঘরে তুলে দিয়ে আসি।—রাজু, ও রাজু, আলোটা একবার জ্বেলে দাও ত।

সিঁড়ির আলোটা জ্বলে উঠল, এবং সেই আলোয় রমেনের একখানা হাত ধরে অন্য হাত পিঠের দিকে দিয়ে শোভা রোগীকে নিয়ে উপরে উঠল, এবং অন্য কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কিছুমাত্র বিবেচনার সময় না নিয়ে সে নিজের শোবার ঘরের সুন্দর পালঙ্কের উপর রমেনকে শুইয়ে দিল। রাজু পিছনে পিছনে এসে পাখা খুলে দিয়ে গেল। রমেনের পায়ের জুতো-জোড়াটা নিয়ে শোভা একপাশে সযত্নে সরিয়ে রাখল।

রাজু বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। শোভা মুখ বাড়িয়ে বলল, শরীরটা ওঁর ভালই ছিল না, তারপর সারাদিনের রোদ্দুর আর রপ্টানি। আমারই ভুল হয়েছে, না নিয়ে গেলেই হত। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। একটু খাবার জল দাও ত রাজু।

রাজু তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে দিল। জল নিয়ে শোভা

ঘরে গিয়ে ঢুকল, এবং সেই জলে হাত ভিজিয়ে সে ধীরে ধীরে রমেনের কপালে বুলিয়ে দিল। রোগীর চোখে লাগবে বলে আলোটা সে জ্বালল না।

মিনিট দুই পরে রমেন চোখ খুলে আস্তে আস্তে বলল, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আজ দুদিন থেকে একটু জ্বর হচ্ছিল। তার ওপর এখানে বিকেলের দিকে খাবার পর থেকেই কি রকম যেন লাগছিল। মাথাটা ভাল ছিল না।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শোভা বলল, এখন কেমন মনে হচ্ছে?

রমেন চুপি চুপি বলল, আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।

প্রিয় সম্ভাষণটা শুনে শোভার সর্বশরীরের রক্তপ্রবাহে যেন পলকের মধ্যে বিপ্লব বেধে গিয়েছিল। চোখদুটো যেন তার নিবিড় রসে নিমীলিত হয়ে এল। এ কি বিচিত্র কৌতুক।

বাইরে থেকে ফটিকের গলার আওয়াজ শোনা গেল—মা।

শোভা বাইরে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তারকে কি খবর দেব?

বোধহয় দরকার হবে না। উনি শুধু বিশ্রাম চান্। তুই বাইরে থাক, ঘণ্টাখানেক পরে বুঝতে পারব।

ফটিক বলল, গাড়ি রেখে দিলুম তাহলে—।

আচ্ছা।—বলে শোভা আবার ঘরে এসে ঢুকল। পা-দুটো তার কাঁপছিল। তবু কাছে এসে সে দাঁড়াল।

রমেন বলল, তোমাকে ভাল করে জানবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছি কেন বলত? এ-ঘর আর বিছানা কি তোমার, শোভা?

শোভা জবাব দিল না। শুধু তার হাতখানা রমেনের কপালের ওপর স্থির হয়ে রইল। রমেন বলল, জানি নে হঠাৎ আজ মাথাটা ঘুরে গেল কেন, তবে একথা সত্যি, তোমার গান শুনতে শুনতে

কেমন করে যেন লোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, শোভা।

মৃদু গলায় অনেকক্ষণ পরে শোভা বলল, লোভ ত তোমার নেই।

রমেনের বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্পের দোলা লাগল। ধরা গলায় সে বলল, আছে, ভয়ানক আছে। আমি যে গরীব, বহু-জন্মের দারিদ্র্য আমার সম্বল। সেইজন্যই আমার সাংঘাতিক লোভ, তোমাকে একান্ত করে জানব। ভয় পেয়ো না আমাকে, কাছে এসো।

শোভা মুখখানা একটু নীচু করে আনল। বলল, কই তুমি ত বললে না, আমি তোমাকে জানব কেমন করে ?

রমেন বলল, ভয় করে শোভা, তোমাকে মনের কথা খুলে বলতে।

ভয় কেন ?

হয়ত আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, আর নয়ত তুমি বুঝতে না পেরে দুঃখ পাবে। বিশ্বাস কর, আজ আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমাকে একান্ত করে অনুভব করেছি।

শোভা বলল, মীরার ভজন বুঝি তোমার ভাল লেগেছিল ?

হ্যাঁ—

শোভা পুনরায় বলল, সত্যিই বলছি, ও গান আজ আমি শুধু তোমার জন্যেই গেয়েছিলুম। গান আমার সার্থক হল এতদিনে। কই, বললে না কি বলতে চাইলে ?

রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, না থাক্, আজ মন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে তোমার ওই ভজনেরই মাধুর্যে। আজ থাক্। শুধু এইটুকু জেনে রাখতে চাই—তুমি তোমার বৈষয়িক জীবনের আসক্তির মধ্যে আমাকে কখনও টেনে আনতে চাইবে না।

তোমার আমার এ বন্ধুত্বের মধ্যে বিষয়-বৈভব-বিলাস-সম্পদ—কোনটার মোহবন্ধন যেন না থাকে।

রমেনের ঘন চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে শোভা বলল, কোন্ চেহারা নিয়ে দাঁড়ালে আমি যোগ্য হতে পারব, বলে দাও?

রমেন আবার চুপ করে গেল। তারপর একসময়ে সে উঠে বসল। বলল, না, একথা আজ বলতে পারব না, শোভা। আজ ছেড়ে দাও, তোমার গানের ওই ধুয়োটা নিয়ে একলা ঘরে গিয়ে পড়ে থাকি। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া না করলে তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারব না। আজ আমি যাই, শোভা।

শোভার চোখদুটি ঝাপসা হয়ে এসেছিল। বলল, তোমার মনের কথা যে বুঝি নি তা নয়। তবু প্রথম দিনের কথাটা আজ আবার বলি, আমাকে কোনমতেই কি তুমি টেনে তুলতে পার না? অনেক নীচে পড়ে আছি ওদের মাঝখানে, ওরা মারতে চায় আমার গলা টিপে—তুমি যদি সামনে এসে দাঁড়াও, তুমি কি ছোট হবে? আমার গানের মধ্যে যে আকুল প্রার্থনা ছিল, সে কি তোমার কানে ওঠে নি?

শোভা কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে রমেন তাকে কাছে টেনে নিতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিল। তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, আজ কোন কথা জানতে চেয়ো না, শোভা। আমি তোমারই পাশে এসে দাঁড়াব—সে যোগ্যতা আমাকে অর্জন করতে দাও।

আঁচলে চোখ মুছে শোভা বাইরে এল তারপর রাজুকে ডেকে বলল, উনি একটু সামলে উঠেছেন এবার। কিন্তু আজ আর কিছু ওঁকে খেতে দিয়ে কাজ নেই।—ফটিক, ও ফটিক—

ফটিক নীচের থেকে সাড়া দিল।

গাড়ি তৈরি রেখেছ ত?

হ্যাঁ মা—

রমেন ততক্ষণে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজু বলল, আমাদের এখানে কিন্তু কিচ্ছু অসুবিধে ছিল না। কর্তা-মার ঘরে আপনার বিছানা করে দিতে পারতুম।

রমেন বলল, না রাজু, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। এবার আমি বেশ চলে যেতে পারব। আজ গিয়ে বিশ্রাম নিই, কালই আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

শোভার সঙ্গে রমেন নীচে নেমে গেল।

গাড়িতে উঠে রমেন বলল, ভালই আছি আমি। ভাববার কিছু নেই। আচ্ছা, নমস্কার—

শোভা হাসিমুখে তাকাল। ফটিক গাড়ি ছেড়ে দিল।

চার

মোট তিনখানি ধুতি, একখানি একটু ছেঁড়া—কোমরের দিকে ফিরিয়ে পরলে ছেঁড়াটা অবশ্য দেখা যায় না, কোঁচার পাটের মধ্যে থাকলেও চলে যায়। গেঞ্জি দুটো—নতুন চাকরিতে ঢুকে প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সে কিনেছিল। সাদা শার্টও দুটো—শুধু একটার বাঁ হাতায় আপাতত ছোট একটি তালি পড়েছে। কিন্তু এমনভাবে রিপু করা যে, ধরবার যো নেই। পাঞ্জাবিটা সেবার ধোপায় হারিয়েছে। ওর কাছে প্রমাণ করা গেল না যে, ওটা প্রায় নতুন—অর্থাৎ বছর দেড়েক আগে চাঁদনী থেকে কেনা, একটুও টসকায় নি।

ধোপা এসে সেই কোন্ ভোরে মোট চারটি কাপড় জামা, গেঞ্জি আর চাদরটা নিয়ে গেছে। এর পর ঘরের পাট সারতে দেরি লাগল। বিছানাটা ঝাড়া, জুতোয় কালি লাগান, জলের

গেলাসটা মেজে নেওয়া, আটপৌরে ধুতিখানা সাবান কাচা—এসব সারতে সময় লেগে গেল বইকি। দাড়িটায় হাত বুলিয়ে রমেন দেখল—কামিয়ে নিলেই ভাল হয়—না হয় থাকগে। কাচের গেলাসের মধ্যে ব্লেডখানা ঘুরিয়ে শান্ দিতে সময় একটু লাগবে বইকি। আজকের দিনটা চলেই যাবে।

কাপড়খানা কোমরে কোনমতে জড়িয়ে ঝাঁটাটা নিয়ে রমেন হেঁট হয়ে-হয়ে ঘরটায় ঝাঁট দিতে লাগল. কিন্তু জীপগাড়িখানা এসে কখন্ যে ঘরের বাইরে লন-এর ধারে দাঁড়িয়েছে, রমেন সেদিকে এতক্ষণ ভ্রূক্ষেপই করে নি। অদূরে দাঁড়িয়ে শোভা হাসছিল।

হঠাৎ চোখ পড়ল বাইরে। ঝাঁটাগাছটা হাতে নিয়েই রমেন সোজা হয়ে হাসিমুখে দাঁড়াল। বলল, আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার! আসুন—

শোভা এগিয়ে এসে সহাস্যে বলল, বাঃ, খাতির করবার কী ছিরি! বলি, ঝাঁটাগাছটা কি হাতেই থাকবে?

ওঃ তাই ত—কিছু মনে করবেন না। তা এত সকালে যে?

আজ যে রবিবার, মনে নেই?

রমেন বলল, হ্যাঁ—মনে আছে বইকি। কথাটা কি জানেন? এ ঘরটায় এসে ঢুকলে যেন নিজের পুরনো চেহারাটাতেই ফিরে আসি। আপনি আমাকে ছোঁ মেরে আকাশে তুললে কি হবে, শকুনির চক্ষু ভাগাড়ের দিকে ঠিকই থাকে। কেরানীদের সঠিক প্রকৃতি আপনারা কেমন করে জানবেন বলুন?

হয়েছে, নিন্ সরুন।—ঘরে এসে শোভা ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে বলল, বাইরে গিয়ে দাঁড়ান্—

এর মানে?

মানে—যাকে যেটি মানায়। এই বলে শোভা তার অভিজ্ঞ হাতে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল।

রমেন নিরুপায় হয়ে বলল, এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না বলে দিচ্ছি। পাঁচটা লোক দেখলে বলবে কি? এতে কি মান-সম্ভ্রম থাকবে? কই, ফটিক কোথায়!

সে আর রাজু গেছে বেদেডোবায়। আমি গাড়ি নিয়ে এলুম।

গাড়ি নিয়ে মানে---গাড়ি চালিয়ে? আপনি কি মোটর চালাতেও জানেন?

থামুন, ওটা এমন কিছু বাহাত্বরি নয় যে, উল্লেখ করতে হবে। আঃ সরুন বলছি, ধুলো উড়ছে যে।

বেশ, তবে আপনিই পাউডার মাখুন---বলতে বলতে রমেন সরে এল।

দশ মিনিটের মধ্যে শোভা ঘরের পাট সেরে দিল। রমেন গিয়ে এক ঘটি জল আনল। সেই জলে শোভা হাত আর মুখ ধুয়ে নিল। পরে বলল, নিন্, শিগগির তৈরি হয়ে নিন্।

রমেন বলল, স্নান করে নেব না? সেখানে স্নান করব কোথায়?

স্নানের ব্যবস্থা সেখানে হয়ে যাবে।

কিন্তু সেখানে ত আর কাপড় বদলাবার ব্যবস্থা নেই।

মুখ টিপে হেসে শোভা বলল, সে ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারবেন। এখন দয়া করে ধোপদস্ত কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিন।

আশপাশে ত্নএকটি অফিসের বাবু রমেনের ঘরের সামনে দিয়ে একটু ঘনঘনই যাতায়াত করছিল। যে-ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা করুণার পাত্র, তার ঘরের সামনে জীপগাড়ি নিয়ে তরুণী এসে দাঁড়ায়, কোমর বেঁধে ঘর ঝাঁট দেয়, এবং হাসিমুখে আমন্ত্রণ জানায়---এর অর্থটা খুব স্পষ্ট নয়। ওদের মধ্যে সাহস করে একজন এবার এগিয়ে এল, গলা বাড়িয়ে বলল, রমেন বাবুর যে কদিন ধরে দেখাই পাওয়া যায় না। ক্লাবেও যান্ না, সকালে সামন্তর হোটেলেও আজ-কাল দেখি নে,---বড্ড ব্যস্ত থাকেন বুঝি?

রমেন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ব্যস্তই হতে হচ্ছে। এঁরা এসেছেন---আজ এঁদের বাগান-বাড়িতে নিয়ে যাবেন।

তা বেশ ত! এই ত আমোদ-আহ্লাদের বয়স। সামন্তর ওখানে শুনলুম, আপনার চাকরি বুঝি আরও মাস ছয়েকের জন্য থেকে গেল। বেশ, খুব আনন্দের কথা। এমনি করতে করতেই পাকা হবে। এইবার একটি কাজ করে ফেলুন, রমেনবাবু---

সবিনয়ে রমেন বলল, কি বলুন?

একটি মনের মতন বিয়ে করুন—হেঁ হেঁ—

অস্থায়ী চাকরি নিয়ে বিয়ে করতে সাহস হয় না।

ওসব কাজের কথা নয়, মশাই। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আপনি কি খাওয়াবার মালিক?

রমেন বলল, আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন, বড়বাবু। ওটা এতদিন ভেবে দেখি নি।—সত্যিই তো, কে কাকে খাওয়ায়।

ঘরের বিছানাটা ততক্ষণে শোভা দুরস্ত করে রাখছিল। বড়বাবু একবার সেইদিকে চেয়ে একটু গলা নামিয়ে বললেন, আচ্ছা ভায়া, এই মেয়েটিই না সামন্তর হোটেলে মাঝে মাঝে আনাগোনা করে? অনেকের সঙ্গে আলাপ-সালাপও করতে দেখেছি।

কথাটা কানে যাবামাত্রই শোভা ফিরে দাঁড়াল, এবং সাপ যেমন মুহূর্তের মধ্যে ফণা তুলে এগিয়ে আসে, তেমনি করে এসে সে বড়বাবুর সামনে দাঁড়াল। বলল, নমস্কার, আমার কথা উঠল তাই থাকতে পারলুম না। হোটেল সামন্তর নয়, হোটেল আমার। আমি সামন্তর মনিব। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আনাগোনা করি বইকি। এখানকার যারা চাকুরে, তারা আমার দোকানে পাত পেতে চেয়ে-চিন্তে খায়, আবার অনেক সময় পয়সা না দিয়ে গা-ঢাকাও দেয়। আমাকে সেজন্যে প্রায়ই আসতে যেতে হয়।

এতগুলি স্পষ্ট কথা একসঙ্গে শোনবার জন্য বড়বাবু ঠিক প্রস্তুত

ছিলেন না। প্রথমটা তিনি একটু যেন থতিয়েই গেলেন, কিন্তু ছোবল মারতে তিনিও ছাড়লেন না। বললেন, রমেনবাবু বুঝি আপনার নতুন খদ্দের?

হাসিমুখে শোভা বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারেই নতুন। আর কিছু আপনার জানবার আছে?

আজ্ঞে না, এইটুকুই যথেষ্ট।

বড়বাবুর সঙ্গে আর দুটি ভদ্রলোকও এসেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই বোধকরি বেগতিক দেখেই বিদায় নিলেন। রমেন একেবারে যেন বোকা বনে গিয়েছিল। ভিতরে এসে ফস করে এক সময় চটে শোভা বলল, আপনার এ ধরনটাই অশোভন। ভদ্র মানুষকে ওরা একালে নির্জীব মনে করে, ভদ্রতার দাম দিতে জানে না।

রমেন বলল, ওদের মুখের ওপর কথা বললে আমার চাকরি যেতে পারে, তা জানেন?

যাক চাকরি—চেঁচিয়ে উঠল শোভা।

চাকরি গেলে খাব কি? তখন সামন্তর হোটেলে খেয়ে আমাকেও গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

অত রাগেও শোভা হাসল। বলল, চাকরি যদি যায় উপোস করবেন, সে ভাল। অসম্মানের চেয়ে উপোস ভাল—এই বলে সে বেরিয়ে এল।

দরজায় তালা বন্ধ করে একটু নেড়ে রমেন এগিয়ে গেল। শোভা আগে উঠে ষ্টিয়ারিং ধরে বসল। পাশে জায়গা নিল রমেন। অতঃপর বেশ গুছিয়ে বসে একসময় সে বলল, সকালবেলা বন্ধুত্ব বেশ জমল ভাল। যে-চাকরি রাখবার জন্য এখানে ওখানে ধরনা দিলুম, সেই চাকরি ছাড়বার জন্যে আপনি কানে মন্তর দিচ্ছেন। হিতৈষী বটে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে শোভা ঘুরিয়ে নিল, তারপর স্পীড দিয়ে বেরিয়ে গেল। এ দৃশ্যটি দেখার জন্যই বোধকরি বড়বাবু একটু গা

বাঁচিয়ে অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার পার্শ্ববর্তী সহকর্মীকে বললেন, না না, শুধু বয়সের নয়, পয়সারও গরম, বুঝেছ? যত দেখবে ততই দাহ বাড়বে। চল, তাস-জোড়াটা নিয়ে বসে পড়ি। আজ সামন্তর ওখানে কথাটা উঠবে বইকি।

অনেকদূর গিয়ে যেদিকে আবার সম্প্রতি গড়ে উঠেছে একটা বিরাট লোহার কারখানা, তারই কাছাকাছি একটা গাছের তলায় এসে জীপগাড়ি দাঁড়াল। অতঃপর হাসিমুখে শোভা বলল, পেছনে হাত বাড়িয়ে পুঁটলিটা দাও দেখি?

রমেন পুঁটলিটি নিয়ে শোভার কাছে দিল। তার ভিতর থেকে বেরোলো গরম গরম সিঙ্গাড়া আর ডিমসিদ্ধ, গোটা চারেক আপেল, এবং চায়ের ফ্লাস্ক। প্লাস্টিকের দুটি থালা বেরোলো, এবং তার সঙ্গে একটি ঠাণ্ডাজলের ব্যাগ—ছিপি-আঁটা।

কাল মাঝরাত্রে বুঝি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আজ সকালেও গাছের পাতায় পাতায় জল জড়িয়ে রয়েছে। নরম রৌদ্র পড়েছে লতায়-পাতায়। ভিজা স্নিগ্ধ হাওয়ায় সোঁদালি বনের গন্ধ ভেসে আসছে। কোলের মধ্যে খাবার নিয়ে খেতে খেতে রমেন বলল, তোমার শত্রুর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, কেন বল ত?

শোভা বলল, একলা থাকি, বোধহয় কারো সহ্য হয় না।

আচ্ছা ধর, সামন্তর ওখানে তুমি আর যাতায়াত নাই করলে। খুব ক্ষতি হবে কি তোমার? কি জান, মেয়েদের নিয়ে কথা রটে বড় সহজে। ওকি, তুমি খাচ্ছ না যে?

শোভা বলল, কাল রাত্তিরে ঠিক করেছি তোমার খাওয়া না হলে আমি খাব না। আমি আধুনিক মেয়ে নই।

হাসিমুখে রমেন বলল, সেকালের মেয়েরা কেউ সভায় বসে গান গাইত না। জীপগাড়ি চালিয়ে কেউ পুরুষ-বন্ধুর ঘর আক্রমণ করত না। নাও, অনুমতি দিচ্ছি, খেতে আরম্ভ কর।

তার আগে তুমি একটি প্রতিজ্ঞা কর।

কি ?

এ চাকরি তুমি ছেড়ে দেবে বল।

সর্বনাশ!—রমেন বলল, ভাত জুটবে কোন্ চুলোয় ?

শোভা বলল, কেন, ওই যে বড়বাবু বললে, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি! না, তামাশা নয়, এ চাকরি তোমাকে ছাড়তেই হবে।

রমেন বলল, বটে, চাকরি ছাড়ার পর কি তোমার এস্টেটের গোমস্তা হব ? গোমস্তা হয়ে পরে হোটেল খুলে বসব সামন্তর মতন ?

শোভা বলল, কেন, তুমি যে আমাকে বললে, আমি আমার সব বাঁধন কেটে বেরিয়ে এলে তুমি আনন্দ পাবে।

রমেন বলল, এ তোমার ভুল শোভা। আমার আনন্দ হবে, তাই জন্যে তুমি সব ছেড়ে ছুড়ে পথে এসে দাঁড়াবে—এমন কথা কখনই আমি বলব না। তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝেছ।

ছুরি দিয়ে আপেল কেটে রমেনের প্লেটের ওপর দিয়ে শোভা বলল, একমাসের মধ্যে আমি এত বদলে গেলুম কি করে তাই ভাবি। ভারি অহঙ্কার ছিল কারো কাছে মাথা নীচু করব না। তুমি আমার অহঙ্কার ঘোচালে। আমি কি ভাবছি জান ?

রমেন মুখ তুলল। শোভা বলল, আমার কিচ্ছু না থাকলেও ত তোমাকে দেখতে পেতুম। বিষয়সম্পত্তি তাহলে আমার বাধা হয় কেন ? এসব আছে বলেই কি তোমার মন পাব না ? ঠিক করে বল ত

রমেন বলল, হ্যাঁ, ঠিক করেই বলব। আগে চা ঢালো।

প্লাস্টিকের পেয়ালায় শোভা চা ঢেলে দিয়ে নিজে একটু আধটু খাবার মুখে দিল। তারপর বলল, এবার বল।

রমেন পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল, তোমার টাকাকড়ি গাড়ি-

বাড়িই আমার পক্ষে বাধা। এ বাধা মস্ত বড়। পুরুষের স্বাভাবিক অহঙ্কার হল এই, আমি তোমার আশ্রিত হতে পারব না। আহত সম্মান-বোধ নিয়ে আমি কোনদিন তোমার সামনে মাথা তুলেও দাঁড়াতে পারব না। এবার বুঝতে পেরেছ? পদে পদে আমার পৌরুষ মার খাবে, এ নিশ্চয় তুমি চাও না।

শোভা বলল, তা হলে বল, কিসে তুমি সুখী হবে?

আমি জানি নে। তোমাকে সব ছেড়ে দরিদ্র হতে বলব তা পারব না, তা তোমাকে হতেও দেব না। আমার জন্যে যথাসর্বস্ব তুমি বিলিয়ে দেবে, এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু নেই।—রমেন বলল, আর আমার কথা? আমি বরং চিরদিন একশ দশ টাকার কেরানী থাকব, বরং দূরে দাঁড়িয়ে দেখব তোমাকে, কিন্তু কাছে এসে কখনও হাত বাড়াতে পারব না।

শোভা বলল, আমার কি করা উচিত বলে দাও।

এ প্রশ্ন আর তুলো না, শোভা। কোন পরামর্শ তোমাকে দিতে পারব না। যদি নিজে কিছু ভেবে বার করতে পার তাই করো। কেবল একটি অনুরোধ, তোমার বিষয়-সম্পত্তির ওপর আমার কোন দিন কোন কারণে লোভ প্রকাশ পায়—এই অপমানের থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে রেখো।

শোভা বলল, বেশ, যেদিন সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়ে একা এসে তোমার কাছে দাঁড়াব, সেদিন আমার জায়গা ঠিক থাকবে ত?

আশা করি থাকবে।

শোভা হেঁট হয়ে রমেনের পায়ের ধূলো নিয়ে শুধু বলল, তাহলে তুমি সামন্ত আর লাডুরামের ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে থেকে মিটিয়ে দাও, বাকি সব কথা আমার কাছে থাক্—কেমন?

বেশ।

শোভা গাড়িতে স্টার্ট দিল।

পথ ঘুরে গিয়েছে দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে। গাড়িখানা অনেক দূর চলে গেল। এক সময় শোভা বলল, আশ্চর্য মানুষ তুমি। মনে হচ্ছে তুমি যেন একটা জালের আড়ালে আছ, বেরিয়ে আসতে পারছ না। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি একটুও পাকে নি।

রমেন খুব হাসল। বলল, তোমার সঙ্গে মিলছে না, তাই বুঝি আমাকে অজ্ঞান বলছ ?

একেবারেই না।—শোভা বলল, সব জায়গায় মেলে, একটুও তফাৎ নেই। কিন্তু এক জায়গায় তুমি কোনমতেই নিজেকে বোঝাতে পার না—একটার পর একটা যেন গেরো দিয়ে রেখেছ, সে-গেরো খুলতেই চায় না।

রমেন চুপ করে রইল। স্টিয়ারিং হুইল থেকে ডান হাতখানা সরিয়ে একসময় শোভা রমেনের একখানা হাতের ওপর সস্নেহে একটু চাপ দিয়ে বলল, রাগ করলে না তো ?

হাসিমুখে রমেন বলল, রাগ করা উচিত কি না ভাবছি।

তুমি যে-কথাটা সব সময় ভাবছ সেটা কিন্তু আমি জানি। বলতে বলতে শোভা হাসি চাপল।

রমেন তাকাল শোভার দিকে। শোভা পুনরায় বলল, এত তাড়াতাড়ি এমন করে তোমাকে অধিকার করছি, এটায় তুমি যেন হাঁপিয়ে উঠছ, তাই না ?

রমেন বলল, তাড়াতাড়ি তো আস নি ? দেড় বছর ধরে আড়াল থেকে তুমি আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করেছ, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছ—এ তো তোমারই কথা। জানতে পারি নি তাই—নইলে এক রাজকন্যে তার রাজত্ব নিয়ে আমার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে রয়েছে টের পেলে আমিই গিয়ে হামলা করতুম।

শোভা খুব হেসে উঠল। গাড়ি এসে ঢুকল বেদেডোবার মাঠে।

রাজুকে সঙ্গে নিয়ে ফটিক এসে পৌঁছেছিল বেলা আটটার মধ্যে।

ইতিমধ্যে ঘর দোর পরিষ্কার করে চন্দর একেবারে ফিটফাট করে রেখেছে। কর্তা-মার আমলে এই ছোট বাড়িটি লোকজনে মুখর হয়ে থাকত। কয়েকটা গরুবাছুর ছিল, এক-ঘোড়ার একখানা টমটমও ছিল—এবং তার সঙ্গে সুযোগ-সুবিধা ছিল নানাবিধ।

ভিতরে বড় বড় তিনখানা ঘর। সামনের দিকে মস্ত বারান্দা, ভিতর দিকে তরিতরকারির খামার। সে-খামার ছোট নয়। লোকজন দিয়ে কাজ করালে সারা বছরের শাকসব্জী ফলান যায়। দক্ষিণ দিক ঘেঁষে আম-কাঁঠালের বাগান, ভিতরে ভিতরে গোটা তিনেক লীচু গাছ। তা ছাড়া পেঁপে লেবু ডুমুর পেয়ারা—এবং আরও নানা জাতের গাছে দক্ষিণ দিকটা ভর্তি। কর্তা-মা বছরের মধ্যে আট নয় মাস এখানেই থাকতেন।

বাড়ির চৌহদ্দি প্রায় সাত বিঘের মতো জায়গা নিয়ে ঘেরা। এ ছাড়া পুকুর অত বড়। কয়েকটা তাল-নারকেলের গাছ রয়েছে পুকুরের ওদিকটায়। সেটা পেরিয়ে গেলে ধানি জমি। এবার ধান হয়েছে ভাল। দিঘি এবং আশপাশের জায়গা বাদ দিয়ে ধরলে প্রায় চল্লিশ বিঘের জমিতে ভাল ফসল হয়। চন্দরের লোকজনরাই ওখানে কাজ করে। এখানকার আগাগোড়া হিসেব আজও শোভার রপ্ত হয় নি। সমস্তটাই সামন্তর আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে।

আনাজপত্র দুধ মাছ ইত্যাদি চন্দর সেই ভোর বেলাতেই এনে ফেলেছিল, তার ওপর আজ আবার হাটের বার ছিল। ফটিক এসে নিজেও খানিকক্ষণ ঝাড়ামোছার কাজে লেগেছিল। কলতলাটা অপরিষ্কার ছিল, স্নানের ঘরের দরকারি ব্যবস্থাদি ছিল না—এগুলো ফটিককে দেখতে হয়েছে। ফটিক নিজে একাধারে নানা ব্যক্তি। চাকর, গোমস্তা, ড্রাইভার, বাজার-সরকার—সে সবই।

রাজু রান্নাবান্নার আয়োজন করতে লেগেছিল। সে-ও কর্তা-মার আমল থেকে এ বাড়িতে রান্নার কাজ করে। শোভাকে সে কোলে-

পিঠে করে মানুষ করেছে, এবং ফ্রকপরা মেয়েকে রোজ স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। মেয়েমহলের কাজকর্ম যা কিছু তারই হাতে।

ভাঁড়ারের চাবি খুলে বাসনপত্র বার করে সে যখন ধোওয়া, মাজা করতে বসেছে, তখন শোভা এসে দাঁড়াল। হাসিমুখ তুলে রাজু বললে, আমি ভাবলুম নিজে যখন গাড়ি নিয়ে বেরলে, তখন হয়ত ঘণ্টা দুই বাদে ফিরবে। বাবু ত কিছু দেখেন নি, আসানসোলের ওইদিকটায় একটু ঘুরিয়ে আনলে না কেন, দিদি?

শোভা বলল, যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্য বড় পল্‌কা। দেখলে না কালকে কি হল? তা ছাড়া একটু খামখেয়ালিও বটে।

রাজু বলল, তা যাই বল দিদি, অমন মিষ্টি স্বভাবের ছেলে অনেক ভাগ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ওঁর যেন একটুও অযত্ন না হয় দেখো। কাল যা আমার ভাবনা হয়েছিল, কি বলব।

রাজুর গলার আওয়াজটা কিছু অর্থপূর্ণ। শোভা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, তোমার বুঝি খুব পছন্দ হয়েছে রাজু?

থালাবাসনগুলো গুছিয়ে রাজু এক পাশে জড়ো করে রাখল। তারপর রান্নার জিনিসপত্রগুলি একে একে তুলে নিয়ে সে বলল, মনের কথা বলতে গেলে তোমার কাছে হয়ত তাড়া খেয়ে-মরব।

কি মনের কথা, বল না শুনি?

রাজু মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। পরে বলল, তোমার কে আছে যে, তোমার হয়ে কথা বলবে? সত্যি বলতে কি, প্রথম দিনে আমার একটু ভয়ই হয়েছিল।

শোভা বলল, ভয়! কেন?

ভাবলুম, হয়ত সামন্ত কোন উটকো লোককে ধরে পাঠিয়েছে। ওকে ত কেউ বিশ্বাস করে না। তা ছাড়া নন্দকে সঙ্গে দেখেই আমার ভয় হয়েছিল। ওরা না পারে হেন কাজ নেই। তা সে

যাই হোক, আগে বলো দেখি রমেনবাবুর বাড়ির লোকের দেখা পাব কোথায় ?

ওঁর বিশেষ কেউ নেই, রাজু। দূর সম্পর্কের এক কাকা আছেন, আর আছে একটি ভাগ্নে—সে নাকি চাকরি নিয়ে চলে গেছে দিল্লিতে।

রাজু জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কোথায় ওঁদের ?

হুগলিতে। কিন্তু সে-ভিটেতে এখন আর কেউ থাকে না।

রাজু ভাঁড়ারের জিনিসপত্র নাড়চাড়া করতে করতে বলল, বলতে ভরসা পাই নে, দিদি—উনি যাই হোন্, পুরুষমানুষের মেজাজমর্জি একটু মেনে চলতে হয়। তাই বলে তুমি যেন খামখেয়ালি কাজ কোর না।

শোভা বলল, থাক্ হয়েছে। আজেবাজে কথা পেলে আর ছাড়তে চাও না।— নাও, একটু চায়ের জল চড়াও।

শোভা বেরিয়ে আসছিল বাইরের দিকে, এমন সময় রমেন এসে ঢুকল। পায়ে কাদা মাখা, চোরকাঁটায় কাপড় ভরা, মুখখানা রৌদ্রে রাঙা। রমেন বলল, ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলুম, বেশ লাগছিল। চন্দর সব আমাকে বোঝাচ্ছিল। এখানেও দেখছি সামন্তর দখল আগাগোড়া। লোকটাকে এড়ানো বড় কঠিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

শোভা বলল, কাপড়-চোপড়ের এ দশা আপনি নিজেই করলেন, এখন উপায় ?

ওসব ঠিক হয়ে যাবে। ভারি ভাল লাগছিল এখানে ওখানে ঘুরতে। দেড় বছর পরে আজ মনে হচ্ছে প্রথম আনন্দ পেলুম। —রমেন এসে একখানা চেয়ারে বসল। তারপর পুনরায় বলল, দক্ষিণের জঙ্গলটার মধ্যে আমার ইচ্ছে করে সারাদিন ঘুরে বেড়াই।

শোভা একখানা ফর্সা তোয়ালে এনে দিয়ে বলল, নিন, মুখখানা মুছে ফেলুন। ঘাম গড়িয়ে এসেছে।

রমেন বলল, আমার কিন্তু কোনও পরিশ্রম হয় নি। চন্দর আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখাচ্ছিল, আর আমি ভাবছিলুম, এমনি নধর মাটির ওপর পড়ে থেকে যদি বাকি জীবনটা কাটানো যেত!

শোভা বলল, আপনি যদি কাটাতে চান্, মানা করছে কে?

মানাটা কি আর বাইরে থেকে আসছে? ওটা ভেতরের।—রমেন বলল, সত্যকার গরীব কে জানেন? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাকে ভিন্ন ধরনের জীবন যাপন করতে হয়।

রাজু চা নিয়ে এল দুপেয়ালা। চা রেখে সে চলেই যাচ্ছিল, রমেন ডাকল, রাজু, আজ আমি তোমাদের অতিথি, তা জান তো?

ফিরে দাঁড়িয়ে রাজু হাসল। বলল, এ তো আমাদের ভাগ্যি, দাদাবাবু! মানুষ-জনের অভাবে সব নষ্ট হতে বসল। আপনার যতদিন খুশি এখানে থাকুন। দিদি তো আর মুখ ফুটে বলতে পারেন না।

শোভা হাসল। বলল, দেখেছেন, রাজু একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে বসে রয়েছে।

নয়ত কি? আপনিই বলুন ত দাদাবাবু? দিদির আর আছে কে? ওই সামন্ত আর নন্দ লুটেপুটে সব নিচ্ছে, কেউ বলবার নেই। ফেলে ছড়িয়ে বছরে একশ মণ চাল—দিদির ঘরে একটি মণও ওঠে না। বাগান পুকুর সব জমা নিচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকায়—দিদি বসে রইল হাত তোলার ওপর! ফটিক কিছু বলতে গেলে হাঁকিয়ে দেয়। কিন্তু খাজনা দেবার বেলা দিদিকেই দেখিয়ে দেয়।

মন দিয়ে রমেন সব শুনল। শোভা বলল, এসব ওঁর কানে তুলে লাভ কি, রাজু? উনি একদিনের জন্যে এসেছেন, ওঁকে কেন তুমি ব্যস্ত করে তুলছ?

রমেন বলল, না না, রাজু ঠিকই বলছে। একটা ভয়ানক অন্যায় ঘটে যাচ্ছে চোখের ওপর। বাস্তবিকই এ-সব বরদাস্ত করা কঠিন।

শোভা বলল, বরদাস্ত করতেই হবে। কে ছুটছে হেস্তনেস্তর জন্যে? আমাদের সহ্য করবার শক্তি থাকলেই আমরা খুশী থাকব। নিন্, চা আপনার জুড়িয়ে যাচ্ছে। রাজু, তুমি আর দাঁড়িয়ো না—

হ্যাঁ, এই যাই—বলে রাজু চলে গেল। চায়ের পেয়ালাটা রমেন হাতে তুলে নিল।

বাইরের ঘরটি ফটিক গুছিয়েই রেখেছিল। এটি কর্তা-মার আগেকার ঘর। দেওয়ালে বোকেন মুখুজ্যের মস্ত একখানা ছবি। আসবাবপত্রের চাকচিক্যে ঘরটি বেশ ঝরঝরে। পাশের জানলা খুললেই বাগান। এখনও এক আধটা ঝরা-শিউলী খুঁজে পাওয়া যায় ওখানে।

রমেন এ-ঘরে এসে বিছানাটার ধারে আড় হয়ে বসল। সামনের চেয়ারে বসে শোভা রমেনের কোঁচার খুঁট থেকে চোরকাঁটা বাছতে লাগল। রমেন বলল, দেখা যাচ্ছে সামন্ত দশ হাতে তোমাকে বন্দী করে রেখেছে, পালাবার পথই নেই। তবে ওকে জব্দ করবার ওষুধ আমি বার করতে পারি। এখন বুঝতে পারছি লোকটা সেদিন ভয় পাবার ভান করেছিল। ভয়ানক শঠ!—তুমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে? আমি চাকরি ছেড়ে দিলে তুমি খুশী হও?

শোভা ছোট্ট জবাব দিল—না।

চাকরি রেখে ওর সঙ্গে লড়াই করবার সময় পাব কখন্?

লড়াই করতে কে আপনাকে বলছে? চাকরি গেলে আপনার ভাত জুটবে কোত্থেকে?

রমেন একবারটি চুপ করে গেল। পরে বলল, তা হলে যেমন আছে, তেমনিই চলুক বলতে চাও?

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে শোভা এবার একটু

মলিন হাসি হাসল। বলল, আপনার যেমন কিছুতে লোভ নেই—তেমনি আমারও লোভ নেই আপনি দুদিনের জন্যে আমার উপকারের নাম করে পাঁচজনকে চটিয়ে চলে যান। তার চেয়ে যেমন চলছে চলুক। আপনি বিশ্রাম করুন, আমি রাজুর রান্না-বান্না দেখিগে।

শোভা চলে গেল।

বিছানাটা নরম এবং নধর। বালিশে মাথা দিয়ে কড়িকাঠের দিকে চুপ করে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর কিছু করা গেল না। কেরানী রমেনের ইচ্ছার জোর নেই, বুকের পাটা কম, মেরুদণ্ডের স্বাভাবিক দুর্বলতার মধ্যে শক্তির কাঠিন্য খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি মেয়ের মন পাবার জন্য বিশ্বজয়ী অধ্যবসায়ের দরকার—হুগলির নাবালকের মধ্যে সেই ইচ্ছার প্রবলতা কোথায়? মাথা তুলতে গেলেই মাথা ঠুকবে, সে-আঘাত সইবে না। চরিত্রের দার্ঢ্য আর স্বকীয়তা কই? শক্তি-রূপিনী একটি মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে জীবন-সংগ্রামের দিকে ডাক দিচ্ছে, ডাক দিচ্ছে পৌরুষকে—কিন্তু সাড়া নেই ভীরু কাপুরুষের। শ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন কোনমতে সম্ভব—কিন্তু যদি তার বাইরে আর কোনও কাম্য জীবন থাকে সেটা আসুক অনায়াসে, তার জন্য ক্লেশ নেবার অভিরুচি কম।

রমেন চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল।

সে-বেলায় আহারাদির ব্যাপারে আতিথেয়তার আতিশয্য ছিল, ছিল আন্তরিক আপ্যায়ন এবং অভ্যর্থনা। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে বোধ করি কোথাও কিছু একটা খটকা লেগে থাকবে, সেই কারণে শোভাকে আর কাছাকাছি দেখা গেল না। রমেনকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে সে রইল আড়ালে আবডালে।

কিন্তু চুপ করে সারাদিন বসে থাকার মধ্যে স্বাভাবিক আড়ষ্টতা কিছু ছিল বইকি। নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে পৌরুষেরই অভাব—দরিদ্র

রমেন এটি অনুভব করে বইকি। কিন্তু শোভা তার নিজের সঙ্গে যে সমস্যা নিয়ে এল, তার সমাধান কি অর্বাচীন এবং অকিঞ্চন রমেনের পক্ষে সম্ভব? সে নিজে নিতান্তই সাধারণ, কিন্তু এখানে কোথায় যেন একটি অসাধারণত্বের ডাক আছে। আশঙ্কায় দুর্ভাবনায় দুস্তরতায় তার পথ জটিল, কিন্তু ভিতরে ও বাইরে ডাক এসে পৌঁছচ্ছে, সেটি তাকে স্থির থাকতেই বা দিচ্ছে কই?

রমেন বিছানা ছেড়ে উঠল, চেয়ারখানা টেনে নিয়ে টেবিলে বসে কাগজ কলম টেনে নিল। সামন্ত আর লাতুরামের সঙ্গে মিটমাটের যে সমস্ত শর্তাবলীর কথা উঠেছিল, রমেন তারই একটা খসড়া করতে বসে গেল। মাঝখানে একবার ডাকল ফটিককে, এবং তারই কাছ থেকে দরকারী খবরগুলি সংগ্রহ করে সে লিখতে বসল। ভাল উকিলকে দিয়ে লেখাপড়া করিয়ে চুক্তি-শর্তাদি রেজেস্টারী করে নেওয়া দরকার, এ-কথাটা এক সময় ফটিকই তাকে ধরিয়ে দিল।

অতঃপর ফটিক বলল, দাদাবাবু, আরেকটা কথা। বাড়ি বেচে ছোট-মা থাকবেন কোথায়, এই হল কথা। উনি একা শহর ছেড়ে এখানে এসে থাকতে পারবেন না। এখানে ওঁর বড্ড ভয় করে।

রমেন বলল, হ্যাঁ, সে-কথা আমার মনে আছে ফটিক। আমারও ইচ্ছে নয়, উনি এ-ভাবে এ ধরনের জীবন যাপন করেন। বুঝেছ?

ফটিক মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু আড়াল থেকে কান পেতে ছিল রাজু। সহসা আনন্দে তার মুখখানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টেনে সে বেরিয়ে এসে একপাশে দাঁড়াল। তারপর বলল, আপনাকে একটা কথা আমিও বলতে চাই। গান-বাজনায় দিদির নাম খুব, এ আপনি দেখেছেন। কিন্তু দিদির শত্তুর চারিদিকে ছড়ান।

রমেন বলল, এত শত্রু কেন, রাজু?

হবে না?—রাজু বলল, মাথার ওপর এখন আর কেউ নেই যে।

এত বিষয়-সম্পত্তি, একলা মেয়ে, টাকাকড়িও চারটি আছে, সকলেরই নজর আছে দিদির ওপর। তা ছাড়া লোকে নিন্দেরও সুবিধে পায় —এঁদের আগেকার অনেক ঘটনা লোকে জানে। কর্তা ত আর মানুষ খুব সুবিধের ছিলেন না। তারই ফল ফলছে দিদির ওপর।

রমেন বলল, হ্যাঁ, তা আমি কিছু কিছু জানি বটে। তবে আমিও কথা দিচ্ছি, শত্রু থাকলেও কিছু অনিষ্ট করতে দেব না।

রাজু তবু বলল, আপনাকে লোকে হয়ত অনেক কথা বলে আপনার কান ভারি করতে চাইবে।

কাগজ কলম গুছিয়ে রাখতে রাখতে রমেন হেসে উঠল। তারপর বলল, না না, ওসব নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিয়ো না, রাজু। আমার জন্যে কিছু ভেব না, আমি ঠিক আছি।

হাসিমুখে রমেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেলা পড়ে এসেছে।

একটা কথা সত্য, ব্যাপারটা আগাগোড়া জটিল। ভালবাসার কথা এখানে প্রধান নয়। কিন্তু একটি মেয়ে এমন ভাবে নানা পাকে জড়িয়ে রয়েছে যে, তাকে নিরাপদে সমস্ত দড়িদড়ার ফাঁস খুলে বাইরের আলো হাওয়ায় টেনে আনা কঠিন কাজ। সে কাজ রমেন পেরে উঠবে কিনা এটি সমস্যা। তবু সমস্যা যত বড়ই হোক এই প্রতিজ্ঞা তাকে নিতেই হবে, এর মধ্যে শোভাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলে কোনমতেই চলবে না। শোভা একা নয়, সব নিয়েই শোভা। পিছনে ইতিহাস আছে, সামনে ভবিষ্যৎ আছে—এবং বর্তমানটা জুড়ে রয়েছে একটা কণ্টাকাকীর্ণ পথ।

বাইরে এসে রমেন দেখল, আমগাছটার নীচে শতরঞ্চি বিছিয়ে চন্দরদের সভা বসেছে এবং শোভা তাদের মাঝখানে বসে একটির পর একটি আর্জি শুনে যাচ্ছে। রমেন কাছে এসে দাঁড়াল। শোভা বলল, ঘুম ভাঙল ?

ঘুম !—রমেন বলল, যে-ব্যক্তি এত বড় বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার,

তার ঘুমের সময় কোথায় ? ঘুমোবার জো আছে ? চোখ বুজলেই অমনি দেখতে পাই সামন্ত আর লাহুরামের দলকে! চারিদিকে শত্রু! তাদের মধ্যে আবার তুটি মানুষের কান্নাকাটি, ফটিক আর রাজু। ওরই মধ্যে আমাকে আবার খসড়া লিখে শেষ করতে হবে।

হাসতে হাসতে শোভা উঠে এল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, চন্দর, সামনের রবিবারে আবার আমি আসব— তখন তোদের বাকি কথা শুনব।—চলুন।

তুজনে চলল দিঘির দিকে। শোভা বলল, বেশ মানুষ তুমি। আমি ভাবলুম ছুটির তুপুরে একটু ঘুমোবে, কিন্তু তুমি হিসেবপত্তর নিয়ে বসেছ জানলে টান মেরে সব কেড়ে নিতুম।

রমেন বলল, তোমাকে নিরিবিলিতে চাই শোভা—যেখানে কেউ আসবেও না কেউ থাকবেও না!

শোভা থমকে দাঁড়িয়ে রমেনের মুখের দিকে তাকাল। পরে বলল, কেন ?

কথা আছে।

দিঘির ধারে বসলে কেউ কাছে আসবে না! বল কি বলবে।

রমেন হাসিমুখে বলল, না এখানে নয়, পাখী শুনে যাবে, পুকুরের মাছের কানে উঠবে। প্রজাপতিরা গোয়েন্দাগিরি করে যাবে। এখানে নয়, ঘরে চল।

তুজনে এসে ঘরে উঠল। শোভা একবার ঘুরে দেখে এল, কেউ কাছকাছি নেই। ফটিক বাইরে গেছে। রাজু গেছে কলতলার ওদিকে। ভিতর দিককার দরজাটা সে ভেজিয়ে দিয়ে এল। তারপর কাছে এসে বলল, সারাদিন ধরে আমার কি মনে হচ্ছে জান ? যে আনন্দ তোমার পাবার কথা ছিল, তা তুমি পাও নি।

রমেন বলল, সেকথা বলবার জন্তেই তোমাকে ডেকে নিয়ে

এলুম। আমার অনেক সংস্কার আছে, অনেক আছে ভ্রান্ত-বিশ্বাস আর ভুল ধারণা—এবার কিন্তু তুমি আমার হাত ধরে নাও। আমাকে তুমি ভেঙে ফেল, টুকরো-টুকরো কর, নতুন ছাঁচে ঢালো—আর আমি কোন কথা বলব না। তোমাকে ভাল করে জেনেছি, এই আমার আনন্দ।

শোভা বলল, আমার এমন কি শক্তি আছে যে, তোমাকে নতুন ছাঁচে ঢালব ?

রমেন বলল, তোমার ভালবাসার থেকেই সেই শক্তি পাবে।

ভালবাসা ! তার অধিকার কই ?

তুমি আমার স্ত্রী হবে, সেই তোমার অধিকার শোভা।

শোভা বলল, স্ত্রী ! তুমি যে বলে রেখেছ কোন লোভের মধ্যে তোমাকে যেন টেনে না আনি। আজ আমাকে এমন করে দুর্বল করে দিচ্ছ কেন ?

রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক লোভের বস্তু নয় শোভা, ওটা মানুষের ধর্মের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এ বোঝাপড়া চিরদিনের, এর মধ্যে চুক্তির ঠাঁই নেই। শুধু ভালবাসা নয়, তোমাকে শ্রদ্ধা দিয়েও গড়ে তুলেছি। একদিন তুমি পাশে এসে দাঁড়াতে বলেছিলে, সামনে এসে সাহস দিতে বলেছিলে, এবার তোমাকে আমি মাথায় তুলে নিতে চাই।

শোভা আরও কাছে সরে এল। মুখ তুলল পুরুষের মুখের দিকে। কম্পিত কণ্ঠে বলল, আমার সমস্ত সমস্যা বাদ দিয়েই শুধু কি আমায় নিতে চাও ?

না, সব মিলিয়েই তোমাকে চাই।—রমেন বলল, কাঁটা বিঁধুক, হোঁচট লাগুক, নিন্দে রটুক, শত্রু প্রবল হোক—এদের সঙ্গেই তোমাকে নিলুম।

শোভার দুই চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল। রমেন

পুনরায় বলল, আমি জানি এ কান্না আমার জন্যে জমা ছিল। আমি যেন এর যোগ্য হতে পারি।

রমেন তাকে দুই হাতে কাছে টেনে নিয়ে কতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াল। পরে বলল, আমার আপত্তি কিছু নেই। রাজু আর ফটিককে ডেকে তুমি বলতে পার—ওরা বিয়ের তারিখ স্থির করুক।

মৃদুকণ্ঠে শোভা বলল, আমাকে বলো না, এ খবর তুমিই ওদের দাও। ওরা যা হয় করবে।

রমেন হাসিমুখে তার পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে বলল, আচ্ছা, আমিই দেব। আমার হাত দিয়েই সব ব্যবস্থা হোক। হ্যাঁ, আরেক কথা। তোমার কি মনে হয় সামন্তরা এ কাজে বাধা ঘটাতে পারে?

খুব সম্ভব পারে।

তা হলে খবর এখন চাপা থাক। বিয়ের দিন দুই আগে প্রকাশ করলেই হবে। দিন স্থির করব কাকে দিয়ে? তোমাদের ওখানে পুরুত আছেন?

শোভা বলল, বোধহয় আছেন।

রমেন বলল, ফটিককে দিয়ে রাজু সব ব্যবস্থা করতে পারবে?

নতমুখে শোভা বলল, সে রাজুই বলতে পারে।

রমেন বলল, বেশ, কিন্তু বেশি দেরি কোর না। এখন কার্তিক মাসের শেষ। অগ্রাণের প্রথম দিকে যদি তারিখ থাকে, সেই তারিখেই হোক। ইতিমধ্যে আমি এদিককার সব বন্দোবস্ত করব।

সন্ধ্যার দিকে চা এবং জলযোগের পর ফিরে যাবার তোড়জোড় হচ্ছিল। রমেনের ধোপদোরস্ত ধুতি, জামা এবং জুতো চকচকে হয়ে বেরিয়ে এল। আজ সারাদিনে এটি স্পষ্ট বোঝা গেল, চারিদিকের বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে ফটিক এবং রাজুকে সর্বপ্রকারে বিশ্বাস করা চলে। চন্দরের লোকদের দিয়ে কাজ হবে বটে, তবে তাদের কেউ অন্তরঙ্গ নয়।

যাবার আগে পাকেপ্রকারে রমেন ফটিক আর রাজুকে কথাটা বুঝিয়ে দিল। কাল সকালে ফটিক প্রথমেই যাবে নালু ভটচার্যির কাছে। তিনি পাকা এবং পণ্ডিত লোক। প্রবীণ প্রতিপত্তিশালী এবং ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে তাঁর নামডাক প্রচুর। ফটিক তার এক ভাইপোকেও দেশ থেকে আনিয়ে নেবে। বাজার হাট করার ভাবনা কিছু নেই। নিমন্ত্রণাদির ব্যাপারে ফটিকের ওপরই সব ভার দেওয়া হল।

আজকের দিনটি ওদের পক্ষে স্মরণীয় হয়ে রইল বইকি।

চন্দর এসে সব গুছিয়ে রেখে প্রত্যেক দরজায় তালাচাবি লাগাল। রাজু বলল, আমরা কদিনের মধ্যেই আবার সবাই মিলে আসছি, বুঝলি চন্দর? অনেক রকমের কাজকর্ম সব আসছে, পরে কথা হবে।

আঃ—রাজুর জ্বালায় অস্থির!—শোভা বলল, পেটে যদি কোন কথা থাকে!

রাজু বলল, তুমি থামো দিকি। কেন, একি চুরি না ডাকাতি যে, সব কথায় ভয় করে চলব?

টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে সবাই গাড়িতে উঠল। ফটিক চালাবে, রাজু বসল তার পাশে। ওরা বসল পিছনের সীটে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে চলল। ঠাণ্ডা পড়ছে এবার। গাড়ি ছেড়ে দিল।

কোথায় যেন অপরিসীম অবসাদ দেখা দিচ্ছে শোভার সর্বদেহে মনে। তার সেই শিথিল তনুলতার মধ্যে উগ্র স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ চেতনাটা আজ যেন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মধুর ধ্যানাবেশে সারাদিন পরে জড়িয়ে আসছে তুই চোখ। রমেন নিজের হাতখানা শোভার পিঠের দিকে বেষ্টন করে রাখল।

মাঠ থেকে বেরিয়ে পথে নেমে ডান দিকে তারা চলল। হাট-তলাটা ছাড়িয়ে মিশনারিদের নতুন বাগান পেরিয়ে ওরা বড় রাস্তায় এসে উঠল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল রাণীগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছতে। রাজু আর ফটিক নামল।

গাড়ি থেকে নামবার আগে শোভার কানের কাছে মুখ রেখে রমেন বলল, এবার খুশী ত?

শোভা মুখ ফেরাল মুখেরই ওপর। জড়িত ললিত কণ্ঠে বলল, এই প্রথম খুশী! তুমি?

আমিও।—এই বলে রমেন তার হাতখানার ওপর একটু চাপ দিল।

শোভা নেমে গেল। ফটিক আবার এসে গাড়িতে উঠল। ওদিকের দোকান থেকে লাছুরাম একবার গলা বাড়িয়ে দেখল শুধু। গাড়ি ছাড়বার আগে রমেন ফটিকের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বসল।

গাড়ি চলতে চলতে এক সময় রমেন প্রশ্ন করল, এ কাজ তোমরা ভালভাবে সারতে পারবে ত?

ফটিক তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, বাবু, আমি তিন তিনটে ভাগ্নির বিয়ে দিয়েছি। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।

কি রকম আয়োজন তোমরা করতে চাও?

বেশি নয় বাবু, জনা পঞ্চাশকে ডাকব। তা ছাড়া ছোট-মার ছাত্রী আছে কজন, তারা সবাই এসে কাজ তুলে দিয়ে যাবে। কিচ্ছু ভাববেন না।

রমেন বলল, এ ব্যাপারটা আমার বিশেষ জানাশোনা নেই, বুঝলে ফটিক? আমাকে অন্য ব্যাপার নিয়ে এখন থেকেই মাথা ঘামাতে হবে, দেখতে পাচ্ছ ত? ও বাড়িখানা লাছুরাম কিনবে বলে মনে হয়?

ফটিক বলল, পেলে এক্ষুণি কিনবে। তবে পনের হাজারের বেশি ও কিছুতেই রাজী হবে না, তাও বলে দিয়েছে। ছোট-মা যদি

রাজী না হন তবে মামলাটাও ঝুলিয়ে রেখে দেবে, ভাড়াও দেবে না—আবার বাইরে বেচতে গেলেও বাধা দিতে থাকবে। তবে এর চেয়েও বেশি গণ্ডগোল পাকাবে ওই সামন্ত—

কেন ?

বেদেডোবার ওপর ওর দখল বেশি। কাগজপত্র অনেকগুলি আছে ওর কাছে। ওটা যদি ছাড়াতে পারেন বাবু, তবেই সব দিক রক্ষে হয়।

হেডলাইটের আলো ফেলে দ্রুতগতিতে গাড়ি ছুটছিল। সুন্দর মসৃণ পথ। সন্ধ্যার পরে আজ একটু ঠাণ্ডাই পড়েছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে এক সময় রমেন বলল, শুধু বিয়ে নয়, খুব একটা ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে হচ্ছে, বুঝলে ফটিক, তোমরা সবাই মিলে আমার পাশে দাঁড়াবে এই আমার ভরসা।

ফটিক বলল, আপনাকে কিচ্ছু বলতে হবে না বাবু—

আচ্ছা, বেদেডোবায় সবাই মিলে থাকার অসুবিধে কি, ফটিক ?

কিচ্ছু না—ফটিক জবাব দিল, ও মাটিতে কাজ করলে সোনা ফলে। বিঘে পিছু দশ মণেরও বেশি ধান। এই তো দেখুন না প্রায় ষাট মণ আলু উঠছে এবার। শুধু আদা আর হলুদ বেচলে খাজনা উঠে যায়। এর ওপর সরষে কলাই মটর—সবই আছে। কিন্তু পাবার কিছু জো আছে ? আজ ছ বচ্ছর নাকি সামন্ত শুধু কর্তা-মার দেনাই শুধছে। আমরা চাকর-বাকর, আমাদের মাথা তোলবার জো নেই। আজ এই নিয়েই বোধহয় মায়ের সঙ্গে চন্দর আর মানিকদের কথা হচ্ছিল। ওরা সামন্ত আর নন্দকে ভয় করে খুব।

রমেন বলল, তাহলে বলো, সামন্ত এই সব নিয়েই তার দোকানের উন্নতি করেছে।

গাড়ি ঘুরিয়ে স্টেশন পেরিয়ে এসে ফটিক বলল, দোকানের সব

মালই ত বেদেডোবার, বাবু। সরষে, হলুদ, আদা, চাল ডাল—কি নয়? কিন্তু বলবে কার বুকের পাটা। ওরাই ত সব লুটেপুটে খাচ্ছে।

গাড়ি এসে থামল কোয়ার্টারের সামনে। রাত প্রায় নটা বাজে। রমেন নামল। ফটিক বলল, যখন যা হয় আপনাকে আমি খবর দিয়ে যাব। আপনি যদি শক্ত হয়ে দাঁড়ান বাবু, ওরা সব ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে।

রমেন একটু হাসল। ফটিক নমস্কার জানিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পকেট থেকে চাবি বার করে রমেন তালাটি খুলে একবারটি আলোটা জ্বালল। তারপর জামা ও গেঞ্জি খুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে আলনায় গুছিয়ে রাখল। পুরনো লুঙ্গিখানা পরে কাপড়খানা ছাড়ল। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঢক ঢক করে খেল এক গেলাস। তারপর দরজা বন্ধ করে শোভার সজল দুটি চোখ সামনে রেখে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

বিকালের দিকে সামন্ত এসে রমেনের চৌকির উপর বেশ গুছিয়ে বসল। বলল, দুদিন তোমাকে না দেখে মনটাও খারাপ, তার ওপর আবার তুমি যে সেই ভয় দেখিয়ে রেখেছ—তাতেও আমার চোখে ঘুম নেই, ভাই। কোথায় ছিলে শনিবার থেকে?

রমেন বলল, আমি কি করব সামন্ত মশাই—কাগজপত্তর টুকিটাকি দিয়ে ওঁরা আমাকে এটর্নীর বাড়ি পাঠিয়েছিলেন। আমি বুঝতে পারছি তোমার কেস খারাপ।

কিসে বুঝলে?

আমি উকিল নই, সামন্ত মশাই। যারা বোঝবার তারা বুঝেছে। কাল অনেক রাত্তিরে ফিরেছি বর্ধমান থেকে।

সামন্ত বলল, বেদেডোবায় যাও নি? শোভা তো তোমার সঙ্গেই ছিল, দাদাভাই?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, তিনিই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন এটর্নীর ওখানে। এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না, সামন্ত মশাই। তুমি নানারকমে নিজেকে ফাঁসিয়ে রেখেছ।

সামন্ত শুধু বলল, হুঁ। তোমাকে একটু চালাক চতুর মনে করেছিলুম। যাই হোক, তর্ক তা হলে মিটবে না বলছ? কত টাকা শোভা চায় বল তো?

রমেন বলল, দোকান যদি সত্যিই তার হয়, তাহলে চার আনা বাদ দিয়ে সবই সে দাবি করবে। দেখছ তো, আজকাল ছোট বড় সব কারবারীদের ওপর গভর্নমেণ্টের ভয়ানক চোখ। একটু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষে নেই।

হঠাৎ নিজের চেহারাটা সামন্ত প্রকাশ করল—ভয় দেখিয়ো না দাদাভাই, ওসব আমি জানি। কিসে মিটতে পারে তাই বল।

জামার পকেট থেকে গত-কালকের খসড়াটা রমেন বার করল। বলল, এটা কাল সারাদিন ধরে সবাই মিলে বসে তৈরি করা হয়েছে।

সামন্ত বলল, পড় শুনি। আমি শুধু সই করতে জানি, লেখা-পড়া শিখি নি।

রমেন কাগজখানা পড়ে ওকে শুনিয়ে বলল, তুমি সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়েছিলে শোভার মা-র কাছে। তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁরই ব্যবসায়ে তুমি নেমেছিলে। সবই তাঁর—তোমার কেবল টাকায় চার আনা প্রাপ্য।

হ্যাঁ, তাই।

সুতরাং সেই সাড়ে তিন হাজার টাকার বদলে তোমাকে দিতে হবে সাত হাজার টাকা, আর মাস মাস দেড়শো টাকা।

সামন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, আর রাণীগঞ্জের বাড়ি?

ওটা পনের হাজারে কিনবে লাছুরাম, তার সঙ্গে গত আট-মাসের সম্পূর্ণ বাড়ির ভাড়া সে দিয়ে দেবে দেড়শ টাকা হিসেবে।—এই বলে রমেন সামন্তর মুখের দিকে তাকাল।

সামন্ত প্রশ্ন করল, ঠাকরুণ থাকবে কোথায়?

রমেন বলল, বেদেডোবায়।

সামন্তর মুখখানা যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, এটা অবিশ্যি মন্দ যুক্তি নয়। তা ছাড়া সবাই ঘরের লোক। কাজ কি মামলা মোকদ্দমায়? সাত হাজার টাকা অবিশ্যি একটু বেশি, তার সঙ্গে আবার ওই মাস মাস দেড়শ। তবে হ্যাঁ, পাওনাটা স্বীকার করে নিতে হয় বইকি।

আমিও তাই বলি সামন্ত মশাই—মামলা মোকদ্দমায় কাজ নেই। নিজেদের মধ্যে সব মিটিয়ে ফেলাই ভাল।

সামন্ত বলল, শোন দাদাভাই, সাত হাজার টাকাটা একটু বেশি। ওটা পাঁচে নামিয়ে আন। এতে তোমারও লাভ।

আমার! আমার লাভ কিসের?

সামন্ত সগৌরবে বলল, 'ফেল কড়ি মাখো তেল!' ওটা যদি পাঁচে তুমি মেটাতে পার—তুমি যদ্দিন থাকবে এই দুর্গাপুরে, তোমার ভার আমি নেব।

হাসিমুখে রমেন বলল, চেষ্টা করব যদি ঠাকরুণকে রাজী করাতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।

কি?

লাছুরামের সঙ্গে মিটমাটের ঝুঁকি তুমি নেবে।

বেশ, নিলুম।

রমেন বলল, সাত দিনের মধ্যে বেচা কেনা শেষ করতে পারবে?

সামন্ত বলল, পারব। টাকাকড়ি নিয়ে লাহু বসেই আছে। তুমি তাহলে উকিলকে দিয়ে লেখাপড়া সব করিয়ে দাও। ভাল কথা, আমার সঙ্গে ঠাকরুণের মিটমাটটা হবে কি ধরণের?

রমেন বলল, দোকানের মালিকানা তিনি ছেড়ে দেবেন। এ টাকা পেয়ে তিনি রসিদপত্র কিছু দেবেন না। তোমার দোকানের লাভ লোকসান যাই হোক, প্রতি মাসে দেড়শ টাকা হিসেবে তুমি তাকে দিতে বাধ্য থাকবে।

সামন্ত ভুরু তুলে প্রশ্ন করল, কতকাল?

তাঁর চুল পেকে ঝরে যাওয়া পর্যন্ত!—রমেন হাসল।

সামন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে বলল, দেখো দাদাভাই, তুমি-আমি দুজনেই বাইরের লোক, সুতরাং বলতে বাধা নেই। ধর, মিটমাট সব হয়ে গেল, কিন্তু নন্দর ব্যাপারটা? নন্দর সঙ্গে ঠাকরুণের মালা-বদলটা তুমি দাঁড়িয়ে থেকে করিয়ে দাও না কেন?

রমেন বলল, সে কথাটা আমিও ভাবছিলুম, সামন্ত মশাই। কিন্তু মেয়েমানুষের মন ত? এ সব ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট থাকতে ওটা বোধহয় হবে না। আমি বলি দেনা-পাওনার ব্যাপারটা আগে সব মিটে যাক, তারপর নন্দ গিয়ে যদি ওঁর আশপাশে ছোঁক ছোঁক করে—তাহলে বুঝতেই পারছ, মেয়েমানুষের মন, না মতিভ্রম! নন্দকে বলো, একটু ফিটফাট হয়ে ঘুরে বেড়াতে। বাঁশী বাজাতে জানে নন্দ?

সামন্ত বলল, শিখতে কতক্ষণ।

পদ্য-টদ্য লিখতে পারে?

সামন্ত মুখ তুলে তাকাল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, দোকানের হিসেব লেখে, আর পত্ত লিখতে পারবে না? তুমি একটু দেখিয়ে দিয়ো। ছেলেটা একটু মাটো কিনা—

রমেন হাসি চাপছিল, সামন্ত সেটি লক্ষ্য করে নি। এক সময় সামন্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, বেশ, ওই কথাই রইল। নন্দকে আমি গড়ে পিটে তৈরি করে দেব। তুমি তাহলে এদিকটা দেখ, আমি টাকাকড়ি যোগাড়যন্তর করি। এখন চললুম।

সামন্ত অনেকটা যেন খুশী মনেই চলে গেল।

লোকটা চলে যাবার পর রমেন নিজের মনেই হাসল বটে, কিন্তু হাসির পিছনে দুর্ভাবনাটা কম ছিল না। আগুনের দিকে সম্ভবত হাত বাড়ানো হচ্ছে, হাতখানা যদি পোড়ে তবে দোষ কারোকে দেওয়া চলবে না। সামন্ত বুঝতে পারে নি কিছু, কিন্তু বুঝতে যদি পারে, তাহলে তার চেহারাটা কি প্রকার হিংস্র হয়ে দাঁড়াবে সেটা অনুমান করতে গিয়ে রমেন ভয় পেল। এইটি সামন্তর বহুকালের উদ্দেশ্য, নন্দকে বিয়ে করতে শোভাকে বাধ্য করা---কারণ এ ছাড়া বেদেডোবার সম্পত্তিটিকে অপর কোনও উপায়ে করায়ত্ব করা সম্ভব নয়। সামন্ত যে এত টাকার শর্ত পালন করতে উদ্যত হয়েছে, তার একটি মাত্র কারণই খুঁজে পাওয়া যায়---বেদেডোবাই তার ভবিষ্যতের ভরসা।

এর পর প্রায় দশ দিন অবধি রমেনকে দৌড়ঝাঁপ করতে হল। মাঝখানে ফটিককে শলাপরামর্শর জন্য পাঁচ সাতবার আসতে যেতে হয়েছে। তার প্রতি নির্দেশ ছিল রাত্রের দিকে আসবার। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে বিবাহের সংবাদ কোথাও না প্রকাশ পায় এবং কোনোরূপ আয়োজন না করা হয়। শোভা যেন একেবারেই না আসে দুর্গাপুরের দিকে, অথবা সামন্তর হোটেলে। রাজু যেন কোথাও কানাকানি না করে। যদি দরকার হয়—এবং দরকার

হবেই—রমেন নিজেই যাবে শোভার ওখানে। লাতুরাম যেন এ বিবাহের আভাস মাত্র না পায়।

প্রায় পনর দিন লেগে গেল কাগজপত্র তৈরি করার জন্য। এদিক থেকে গিয়েছে সামন্ত আর নন্দ এবং লাতুকে নিয়ে ওদের জটলা বসেছে অনেকবার। রমেন মধ্যস্থ হয়ে ডেকেছে শোভাকে, উভয় পক্ষকে শর্তাদি পালনে রাজী করাতে হয়েছে। শোভা আর রমেন গম্ভীরভাবে আলাপ আলোচনা চালিয়ে গেছে। কেবল তাই নয়, নন্দকে ডেকে শোভা কথা বলেছে হাসিমুখে, তামাশা করেছে সামন্তকে এবং সামন্ত পুলকিত হয়ে তার অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন-জাল বুনেছে। বলা বাহুল্য, স্বভাবচতুরা নারীর কাছে সামন্ত বার বার নির্বোধ বনে তাকে বিশ্বাস করেছে।

দলিলপত্র রাণীগঞ্জেই একদিন রেজেস্টারী হয়ে গেল এবং সমস্ত টাকাকড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে ফটিক, নন্দ আর রমেনের সাহায্যে ব্যাঙ্কে আমানত করা হল। নন্দ আর সামন্ত সেদিন বেশ হাসিখুশী ছিল। পরদিন লাতুরাম, নন্দ আর সামন্ত—এরা তিন জনেই এসে তদ্বির তদারকের কাজে লাগল—যাতে এ বাড়ি থেকে শোভা তার সমস্ত আসবাব এবং মালপত্র নিয়ে বেদেডোবার বাড়িতে গিয়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছয়। রাজু আগেভাগে সেখানে গিয়ে চন্দরের সাহায্যে বিলিব্যবস্থা করে রেখেছিল। লাতুরাম এখান থেকে লরী সরবরাহ করল। কর্তা এবং কর্তা-মার আমলের মাল-পত্র নেহাত কম নয়। প্রায় সমস্ত দিনটাই লেগে গেল এই সব স্থানান্তর করার কাজে। আজকের দরুন সমস্ত ব্যয়ভার সামন্তই বহন করছিল।

এতকাল ধরে যে-সমস্যার সমাধান কারো দ্বারাই হয়ে ওঠে নি, সেটি যে রমেনের দ্বারা আজ সম্ভব হল, এটি কেউ ভোলে নি। রমেন আজ ইচ্ছা করেই উপস্থিত থাকে নি, কেন না এক্ষেত্রে তার নিস্পৃহ

চেহারাটা প্রকাশের দরকার ছিল। সে আজ উপস্থিত না থাকায় বিশেষ অসুবিধাও কিছু হয় নি, কারণ নন্দ একাই একশ। শোভা আজ হেসেই অস্থির হচ্ছিল।

রাত প্রায় নটার সময় ফটিক এসে রমেনের ঘরে হাজির হল। টাকা জমা পড়েছে ব্যাঙ্কে এবং মাসোহারা শর্তের দলিলটি রেজেস্টারী হয়ে গেছে—সুতরাং এবার নিশ্চিন্ত। নগদ পাঁচহাজার টাকা ঘর থেকে বের করে দিতে সামন্ত একটু দুঃখই পেয়েছিল, কিন্তু নন্দর কল্যাণে সব টাকাই আবার ঘরে ফিরে আসবে এই অখণ্ড বিশ্বাস তার ছিল বইকি। আর যাই হোক, সামন্ত ভুল করার ছেলে নয়।

ফটিক বলল, বাবু, কাল থেকেই আপনাকে দিন আষ্টেকের ছুটি নিতে হয়। আজ হল চৌঠো, বিয়ের তারিখ সাতই। রাত পোয়ালে মাঝখানে আর দুটি দিন।

রমেন বলল, পুরোহিতের কাছে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ বাবু, সব ফর্দ তৈরি করে এনেছি। তবে আপনার কথা মতন নাম ধাম কিছু এখনো বলি নি। আগে ওঁকে সাত তারিখের বিকালে বেদেডোবায় এনে ফেলি, তারপর কথাটা ফাঁস করব।

লোক হবে কত?—রমেন মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

ফটিক বলল, ছোট-মা বললেন লোকজনের নেমন্তন্ন এখন থাক, জন দশ পনের হলেই কাজ চলে যাবে। পরে একদিন ফলাও করে সবাইকে ডেকে খাওয়ান-দাওয়ান চলবে। কাল সকালে আমি বাজার হাট করে ফেলব, দুপুরের দিকে গাড়ি নিয়ে আপনার এখানে আসব। ছোট-মার ইচ্ছে আসানসোলে গিয়ে সামান্য কিছু গয়না কিনে আনবেন।

বেশ, আমি সঙ্গে যাব।

ফটিকের তাড়া ছিল, সুতরাং ওঠবার আগে সে বলল, আপনাকে বলে গেলুম, গোধূলি লগ্নে বিয়ে।

রমেন হাসিমুখে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা তৈরি হও গে।

ফটিক সেদিনকার মত উঠে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মাঝখানের দুটো দিন কোথা দিয়ে কাটল, ফটিকের আর মনে নেই। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার বিশ্রাম ছিল না, কারণ এক হাতেই তাকে সব করতে হচ্ছিল। বিয়ের দিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধটা আগে করা দরকার। কিন্তু নালু ভট্টাচার্য নাকি ওটার একটা বিশিষ্ট বিধান দিয়ে রেখেছেন।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে, এবং লগ্নের স্থায়িত্ব ঘণ্টা দেড়েক। আনুপূর্বিক আয়োজন অতি দ্রুতগতিতে ফটিককে প্রস্তুত করতে হয়েছিল। পুরোহিতের নির্দেশক্রমে অনুষ্ঠানের উপকরণাদির কিছু ত্রুটি ঘটে নি। এমন কি কুশণ্ডিকার দরুন হোমের কাঠ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়েছিল। সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ রাজু নিজের হাতে সম্পন্ন করেছে।

গোধূলি লগ্নের আগে হাতে কিছু সময় ছিল। জীপগাড়িখানা নিয়ে ফটিককে আর একবার রাণীগঞ্জ শহরে আসতে হল। কেনাকাটা সামান্য কিছু বাকি ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করে পুরোহিত মশায়কে সঙ্গে নিয়ে সে আবার ফিরবে বেদেডোবায়। রমেন সকালের দিকে আগেই গিয়ে পৌঁছেছিল। মোট কুড়ি বাইশজন অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুসজ্জন এ বিয়েতে উপস্থিত হবে।

এ বিয়ে কে দিচ্ছে সে কথা ওঠে না! এ বিয়ে হচ্ছে, এই মাত্র। কন্যাকে কেউ সম্প্রদান করছে না, কন্যা স্বেচ্ছায় আত্মদান করছে। শাস্ত্রের উদারতাটি এমনি সম্প্রসারিত যে, কোথাও এ ব্যাপারটা আটকায় না। অথচ এ বিবাহ সম্পুর্ণ আনুষ্ঠানিক, এবং শাস্ত্রসম্মত। ছান্‌লাতলা, স্ত্রী-আচার, সাতপাক—কোনটির ব্যতিক্রম হবার যো

নেই। অন্যান্য প্রত্যেকটি ব্যাপারেও নালু ভটচার্যির নির্দেশ ছিল কঠোর। শাস্ত্রীয় কাজে এতটুকু এদিক ওদিক না হয়, সেদিকে খরদৃষ্টি ছিল।

বাজার হাট শেষ করে ফটিক তার গাড়ি নিয়ে এল নালু ভটচার্যির দোরগোড়ায়। গাড়িখানায় চাবি দিয়ে ফটিক নেমে গিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। খামারের পাশেই বারান্দায় বসেছিলেন নালু ভটচার্যি স্বয়ং। তিনি তাঁর রূপোর চশমাখানা নাকের উপর থেকে সরিয়ে ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে বললেন, থাক্ আর এগিয়ে আসতে হবে না, ওখানে দাঁড়িয়েই যা বলবার আছে বল্—

ফটিক তাঁর গলার আওয়াজে একটু চমকে উঠল। বলল, আপনাকে নিয়ে যেতে এলুম—

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন ভটচার্যি মশায়—বেটা শয়তান, অধার্মিক। আমার জাতধর্ম নষ্ট করবার ফিকির করেছিস? আগে কেন আমাকে বলিস নি, ওই বেজন্মা মেয়েটার বিয়ে আমাকে দিতে হবে? হারামজাদা, শূয়োর—

আপনি কি বলছেন, ঠাকুরমশাই?

ভটচার্যি মশায় হেঁকে উঠলেন, খবরদার, ফের যদি কথা বলবি তবে জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব। বদমাইস, পাজি, ছুঁচো—নাম ধাম চেপেছিস আমার কাছে। আমার মানসম্ভ্রম, নামডাক—সব নষ্ট করতে বসেছিস। হারামজাদা, জানিস—ও ছুঁড়ি বোকেন মুখুজ্যের মেয়েই নয়। আমাকে নরকে ডোবাতে বসেছিলি, আমার ইজ্জৎ মারতে চেয়েছিলি!

ভটচার্যি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, গোলক! বলি ও গোলক—!

হঠাৎ গোয়াল-ঘরের আড়াল থেকে সামন্ত বেরিয়ে এল। সামনে এসে হেঁট হয়ে ভটচার্যির পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, আমাকে যদি

খড়ম পিটিয়ে মারতে চান ত মারুন ঠাকুরমশাই, ওদের হয়ে আমিই মাপ চাইছি—

ফটিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। সামন্তকে এখানে উপস্থিত থাকতে দেখে তার আর কিছু বুঝবার বাকি ছিল না।

ভটচার্যি মশায় রাগে তখনও কাঁপছিলেন। পুনরায় চেঁচিয়ে তিনি বললেন, এ তোমার দোষ সামন্ত—এ দোষ ওই বেটা নন্দর। তোমরা আগে জানালে ফটিককে আমি বাড়িতে ঢুকতেই দিতুম না। কোন্ পুরুত আছে দেখি ত রাণীগঞ্জে, কার এমন বুকের পাটা, দিক্ ত দেখি এই বিয়ে? এ বিয়ে দিলে আর কারো ঠাঁই হবে যজমানের ঘরে? জাত-জন্মের ঠিক নেই, বেশ্যে-নটির মেয়ে—তার বিয়ের নাম করে তুই আমাকে ফাঁসাতে চাস? বেরো, দূর হ সামনে থেকে—বেটা জোচ্চোর, নচ্ছার—

সামন্ত এগিয়ে এল। বলল, ফটিক, আর দাঁড়াস নে এখানে। এর পর তোরও মান-ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। এ বিয়ে হবে না বলে রাখলুম—এমন অধর্ম তোর সইবে না। বরং এখান থেকে সোজা দেশে চলে যা—বেদেডোবায় আর ফিরিস নে। নন্দর মুখের গেরাস কেড়ে নিচ্ছিস, এতে কি তোরই ভাল হবে, ফটিক? যা, ঠাকুরমশায়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকিস নে।

ফটিক মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল। আকাশে মেঘ করে এসেছে অকালে। ফটিক একবার সেইদিকে তাকিয়ে গাড়িতে এসে উঠল। পুরুত ছাড়া বিয়ে হবে না সে জানে। কিন্তু কথাবার্তার আভাসে জানা গেল এ অঞ্চলে পুরুতকে খুঁজে বার করার চেষ্টা বৃথা। অন্য কোথাও যেতে হয়। কিন্তু কি করবে এবং কোথায় যাবে ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

গোধূলি লগ্ন আরম্ভ হবার আর দেরী নেই। বেলা পড়ে এসেছে। গাড়িখানা নিয়ে অনেকদূর সে চলে গেল। হঠাৎ একজন পুরুতের

কথা তার মনে পড়ে গিয়ে সে গাড়ি ঘোরাল। লোকটাকে সে দেখেছিল এক বারোয়ারী তলায় রক্ষাকালী পুজোয়। হয়ত মোটা টাকা কবুল করলে কার্যোদ্ধার হতে পারে। গাড়িখানা অনেকদূর অবধি নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় সে রাখল। তারপর নেমে গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল, কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া গেল না। মনে পড়ে গেল আসানসোলে গেলে হয়ত সুবিধে হবে। তখন ছুটল সে গাড়ি নিয়ে। আকাশ অন্ধকার করে তখন বৃষ্টি নেমেছে।

গাড়ির তলা থেকে অনেকক্ষণ অবধি একটা কড়কড়ে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে স্টার্ট নিতে যেন গোলমাল করছে— ব্রেকটার কোথায় যেন আটকাচ্ছে। এ গাড়ি নিয়ে অতদূর যাবার আগে ফটিক একবার থমকে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর গাড়িখানা থামিয়ে, নেমে সামনের দিককার ডালা তুলল। বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ফটিক কয়েকটি কলকব্জা অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করতে লাগল। অতঃপর ডালা বন্ধ করে আবার গাড়িতে এসে উঠে স্টার্ট দিল, কিন্তু এবার আর স্টার্ট নিল না। দুর্ভাবনাটা একটু যেন ঘন হয়ে উঠল।

আধঘণ্টাকাল অবধি মরিয়ার মতো চেষ্টা করে সে যখন ব্যর্থ হল,—বৃষ্টি তখনও থামে নি। না, আর কোনও উপায় নেই। একখানা সাইকেল-রিক্সা তাকে ডাকতে হল এবং অদূরবর্তী মুদির দোকানের একটি লোককে ডেকে গাড়ির ওপর চোখ রাখার অনুরোধ জানিয়ে খুচরো জিনিসপত্র সমেত সে রিক্সায় চড়ে বসল। কথাটা সত্য, তার নিজের মানসম্ভ্রম আজ বিপন্ন। লগ্ন পেরিয়ে চলেছে— এখনও গিয়ে সে পৌঁছতে পারল না, এর চেয়ে পরাজয় তার জীবনে আর কিছু নেই। বকশিশ কবুল করে গাড়িখানা সে ছোটাল।

মাইল খানেক পেরিয়ে রিক্সাওয়ালা থামল। মিশনারীদের

বাগানবাড়িটা তখনও ছাড়ায় নি, পথ এখনও অনেক বাকি। রিক্সাওয়ালা প্রশ্ন করল, আর কতদূর গো ? কোথা যাবে ?

এখনও অনেকদূর, চল্ ভাই তাড়াতাড়ি। বেদেডোবা যাব।

বেদেডোবা ? সে কোথায় ?

ফটিক বলল, গাঁয়ের দিকে—কোশ তিনেক পথ হবে।

লোকটা বলল, নামুন বাবু, আমি পারব না। গাড়ি জমা দিতে হবে।

এত বিষ্টিতে নামব কোথায় রে ? কত বকশিশ চাস বল্।

বকশিশ আমি চাই নে। আমি যেতে পারব না—নামুন।

অনুরোধ উপরোধ কোনটাই রইল না। ফটিককে সেই বৃষ্টিতে নেমে আট আনা ভাড়া চুকিয়ে রিক্সা বিদায় করতে হল। বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে চলেছে, পথ জনহীন। কোঁচার খুঁট খুলে খুচরো জিনিসপত্রগুলি বেঁধে অগত্যা ফটিককে পথে নামতে হল। সন্দেহ নেই, বিবাহের লগ্ন পেরিয়ে চলেছে। বেদেডোবায় এতক্ষণ কি ঘটছে কিছুই বলা যায় না। ফটিক কিছুক্ষণ পথের ধারে গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু যানবাহনের কোনও চিহ্ন কোনোদিকে দেখা গেল না। কান্না পেল ফটিকের।

আর কোনও উপায় নেই। ফটিক হঠাৎ যেন ছিটকে এগিয়ে গেল সেই বৃষ্টির মধ্যে। তাকে হেঁটেই যেতে হবে। সুতরাং সে ছুটতে ছুটতে চলল। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ল।

বেদেডোবার মাঠে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এমন অকালবর্ষণ সহসা দেখা যায় না ; তার উপর বয়ে চলেছে হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে। বাড়িতে কয়েকটা আলো জ্বলেছে বটে, কিন্তু সেগুলি বড় বিষণ্ণ। বিয়েবাড়ি বলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

ফটিক এসে পৌঁছয় নি, পুরুত আসে নি, নিমন্ত্রিত অথবা অভ্যাগত কেউ না। শোভার একান্ত প্রিয় ছাত্রী কমলা কোনমতে সকালের দিকে এসে পৌঁছে রাণীগঞ্জের দু-একটি সংবাদ দিয়েছে মাত্র—শোভা তার থেকেই বিপদের সঙ্কেত পেয়েছিল। পুরনো কালের অনেক কাহিনী যেন কাদা মেখে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

সমস্ত দিনমান ধরে সোৎসাহে রাজু কাজে লেগেছিল, কিন্তু অবেলায় আগাগোড়া ব্যাপারটা অনুধাবন করে সে অন্তরালে গিয়ে কাঁদতে বসেছে। শেষ পর্যন্ত পুরোহিত এল না, এবং তাঁর সঙ্গে নারায়ণও এসে পৌঁছল না। রাজু একান্তে বসে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল।

পিছন দিকের বারান্দায় একখানা আসনের উপর চুপ করে রমেন বসে কি যেন ভাবছিল। শোভা বসে রয়েছে এক পাশে, কমলা রয়েছে সামনে। কমলা এক সময় বলল, রমেনবাবু, নারায়ণ আর পুরুত ছাড়া কি বিয়ে হয় না?

গলা ঝাড়া দিয়ে রমেন বলল, গান্ধর্বমতে হয়ত হয়, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী হয় না।

কমলা বলল, আমার বিয়ে হয়েছে বছর দুই হতে চলল। সবাই যে বলে, আগুনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করলে, সে-বিয়ে নাকি সিদ্ধ হয়? আগুন জ্বালব শোভাদি?

শোভা বলল, জ্বেলে কি করবে, কমলা?

কমলা চোখের জল মুছে বলল, তোমাদের মাঝখানে আগুন জ্বলুক। সেই আগুন এ বিয়ের সাক্ষী থাক?

রমেন বলল, আচার্য উপস্থিত না থাকলে সে-আগুন পবিত্র হবে কেমন করে, কমলা? অগ্নিদেবতা আর স্বাহার উপলব্ধি হবে কেমন করে? মন্ত্রেই যে তাঁদের আর্বির্ভাব।

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর নিজেই সে উঠে

দাঁড়িয়ে বলল, না রমেনবাবু, এ অপমান স্বীকার করব না, আপনি আমাকে আগুন জ্বালবার অনুমতি দিন। কেউ না থাক, অন্তর্যামী আছেন—তাঁকেই সাক্ষী রাখুন। আমার স্বামী বলেন, মনে প্রাণে গ্রহণ করাই হল বিয়ে।

তবে জ্বালো।—রমেন শান্ত কণ্ঠে বলল।

কমলা তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, এবং ছুটোছুটি করে রাজুর সাহায্যে কাঠকুটো এনে বারান্দার উপর হোমকুণ্ডর মতো একটি আগুন জ্বালাল। বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে, মেঘের ডাক শোনা যাচ্ছে আকাশে। কাঠের আগুন সামনে জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে—আর সেই আগুনের সামনে বসে রইল তিন জন। শোভার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এল। স্তব্ধ নিমেষ-নিহত দৃষ্টিতে সেই আগুনের দিকে চেয়ে রমেন চুপ করে বসে রইল।

কমলার ব্যাকুল দৃষ্টি বার বার ওই কাঠের আগুনের ভিতর থেকে অগ্নিদেবতা ও স্বাহাকে খুঁজে ফিরছিল কিনা কে জানে!

বৃষ্টি যখন ধরল রাত তখন বোধ করি নটা বেজে গেছে। দূরের থেকে দেখা গেল কে একজন একটি লণ্ঠন হাতে নিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। ওরা উৎসুক হয়ে ফটিকের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তার সঙ্গে জীপগাড়িখানা থাকবার কথা। রমেন উঠে বারান্দা থেকে নেমে এল। আলোটা কাছাকাছি আসতে দেখা গেল-না ফটিক নয়, নন্দ।

কাছে এসে ছাতাটা বন্ধ করে নন্দ বলল, এই যে রমেনবাবু, আপনার ব্যাপার কি? সারাদিন ফেরেন নি।

আমি এখানেই আছি, নন্দ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত দেখছি। জামাইবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনার ওখানে বুড়ো এক ভদ্রলোক এসেছেন হুগলি থেকে, সঙ্গে একটি মেয়ে। ভদ্রলোকের নাম হরমাধব ভট্টাচার্য।

আপনার ঘরে তালা বন্ধ, তাঁরা সেই বিকেল থেকে বারান্দায় বসে রয়েছেন। আপনার এখুনি যাওয়া দরকার।

হোমের আগুন নিবে এসেছে। সেই দিকে একবার তাকিয়ে রমেন শোভার দিকে ফিরে বলল, তা হলে আর উপায় কি। নন্দর সঙ্গে আমাকে এখুনি একবার যেতে হয়।

শোভা বলল, ওঁরা কি সেই ধার-দেনার ব্যাপার নিয়েই এসেছেন?

হ্যাঁ, উনি আমার গাঁ-সম্পর্কে দাদামশাই, আর মেয়েটির নাম রেবা—ওঁরই নাতনী। সেই যে আমি বলেছিলুম আমার একটি নৈতিক ঋণ আছে, দাদামশাই সেই সম্পর্কেই এসেছেন। আমি এখনি না গেলে উনি বড় দুঃখ পাবেন। কাল সকালেই আবার চলে আসব।

শোভা প্রশ্ন করল, ওঁদের খাওয়া-দাওয়া আর থাকার কি ব্যবস্থা করবে? একা পারবে তুমি?

রমেন বলল, আগে গিয়ে শুনি সব কথা। হোটেলেই ওঁদের বন্দোবস্ত করব। আমি না হয় থাকব পাশের ঘরটায়। যা হোক করে চলে যাবে।

নন্দ আড়চোখে এদিক ওদিক নিরীক্ষণ করছিল। কিন্তু কোনও মন্তব্য সে করল না। শুধু বলল, বড় রাস্তায় আমি একখানা সাইকেল-রিক্সা রেখে এসেছি। ওখান থেকে বেরিয়ে অণ্ডালে গিয়ে গাড়ি ধরতে হবে।

বেশ চল—পায়ে জুতো দিয়ে রমেন বেরিয়ে এল।

কমলা একবার গলা বাড়িয়ে বলল, কাল আপনার ওখানে কখন গাড়ি যাবে, রমেনবাবু?

মুখ ফিরিয়ে রমেন বলে গেল, গাড়ি, তা বেশ, আমি ত ছুটিতেই আছি, ওখানেই থাকব। গাড়ি যে কোন সময়ই যেতে পারে।

নন্দ আলোটা আবার হাতে তুলে নিয়ে আগে আগে চলল।

আজকের সমগ্র ব্যাপারটায় রমেনের মনে যে একটু ভাবান্তর হয় নি তা নয়। কোথায় যেন একটা অঙ্ক তার মিলছে না কিছুদিন থেকে, অথচ সেটা তার মনেও স্পষ্ট নয়। কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে একটা ছোট্ট কথা কেমন ভাবে যেন থেকে গেছে, সেটার ধরা ছোঁওয়া আজও পাওয়া গেল না। বিয়ের অনুষ্ঠানটা হতে পারল না —সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্লঙ্ঘ্য একটা বাধা অতিক্রম করা গেল না, এটা একটু আশ্চর্য। সর্বপ্রকার আয়োজন করার পর ফটিক শেষ রক্ষা করতে পারল না, এও যেন একটু অদ্ভুত ঠেকছে। শোভার শান্ত গাম্ভীর্যটাও যেন কতকটা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিল রমেনের মনে। পুরুষের জীবনের সর্বপ্রধান অনুষ্ঠানটি যেন একটা প্রহসনে পরিণত হল—অথচ এর জন্য একটা তুমুল তোলপাড় এল না কোনদিক থেকে—এটাও অভিনব বটে। রমেনের মনটা যেন সর্বক্ষণ খুঁৎ খুঁৎ করছিল।

নন্দ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। মাঠের পথটি পেরিয়ে এসে রাস্তায় নামল। রিক্সাখানা দাঁড়িয়েই ছিল, সেখানায় উঠে দুজনে গুছিয়ে বসবার পর নন্দ এবার বলল, একটি কথা যদি আপনাকে জিজ্ঞেসা করি, আপনি রাগ করবেন, বাবু?

রাগ না করি, এই বলছ ত? বেশ ত, বলই না, নন্দ?

নন্দ বেশ ভদ্রলোকের মত প্রশ্ন করল, আপনি ব্রাহ্মণ, সকলের উঁচু জাত, এসব কাজে আপনার ভয় হল না?

রমেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, কথাটা বুঝিয়ে বল।

জামাইবাবুই আপনাকে বুঝিয়ে বলবেন, আমার মুখ দিয়ে শুনলে আপনার হয়ত রাগ হবে।—এই বলে নন্দ চুপ করে গেল। পরে আবার বলল, এত বড় বিষয়-সম্পত্তির মালিক একজন

মেয়েছেলে, কিন্তু তার বিয়ে কেন হয় নি এতদিন—একথা কি একবারও আপনার মনে হয় নি, বাবু?

রিক্সাখানা স্টেশনের দিকেই চলতে লাগল। রমেন একটি কথাও বলল না। নন্দ পুনরায় বলল, রাণীগঞ্জ শহরে একবারটি খোঁচা দিলেই সব কথা আপনার কানে উঠত। ফটিক আর রাজু এমন করে আপনাকে ঠকাতে পারত না। আপনি ত আর জাত-মান খোয়াবার জন্যে দুর্গাপুরে চাকরি করতে আসেন নি, বাবু।

বিয়ের ব্যাপারটা নন্দ অথবা সামন্তকে একেবারেই জানতে দেওয়া হয় নি, এ সম্বন্ধে রমেন সচেতন ছিল। কিন্তু এদের কাছে কথাটা চাপা থাকে নি, এটা স্পষ্ট। সুতরাং এসব কথার জবাবে ঠিক কৈফিয়ৎটি কেমন করে নন্দকে বুঝিয়ে দেওয়া চলতে পারে, রমেন সেই কথাটাই ভেবে এক সময় বলল, একথা আমি বিশ্বাস করি নে নন্দ, রাজু আর ফটিক আমাকে ঠকাচ্ছিল।

নন্দ একটু হাসল। পরে বলল, বাবু, আমরা জাত-টাত আজকাল তেমন মানি নে, দিনকাল পাল্‌টে গেছে দেখছেন ত? কিন্তু আপনার মতন ভদ্দরলোককে কথার ফাঁদে ফেলে কেউ যদি আপনার জাত-মান নষ্ট করে, তবে কি আপনার লাগে না?

লাগে বইকি। তবে তোমার কথাই যে সত্যি কে বললে? পঁচিশ বছর আগে কে কোথায় কোন্ অবস্থায় কি করেছে, তোমার কি সব মুখস্থ আছে? তুমি নিজে তখন কতটুকু? তোমার জামাইবাবুর উদ্দেশ্যটাই বা কি এমন ভাল?

নন্দ বলল, বাবু, রাণীগঞ্জে সবাই এখনো বেঁচে, বোকেন মুখুজ্যে সকলের নাকের ওপরেই মেয়েমানুষটাকে এনেছিল। কিন্তু কোন্ অবস্থায় তাকে বুড়িবিবির ঘর থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল—দেশশুদ্ধ লোক সবই জানে। আপনি বিশ্বাস না করলে সবাই আপনার দিকে চেয়েই হাসবে।

বেশ, চলো দেখি, সামন্ত মশাই কি বলেন।—এই বলে রমেন চুপ করে গেল। রিক্সাখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টেশনে এসে পৌছল।

ছয়

রমেন আর নন্দ চলে যাবার ঘণ্টা দুই পরে ক্লান্ত শরীরে ফটিক ফিরে এসে বারান্দায় বসে পড়ল। তার কথা বলারও শক্তি ছিল না। রাজু, কমলা, শোভা—ওরা এসে বসল কাছাকাছি। শোভা প্রশ্ন করল, গাড়িখানা কোথায়?

ফটিক বলল, গাড়িখানা বিগড়ে গেল ঠিক সময়ে। ওখানা রেখে এসেছি অক্ষয় মুদির জিম্মায়, ভয় নেই।

প্রায় আধঘণ্টা বিশ্রামের পর ফটিক কথা বলতে পারল, এবং দু-একটি কথা বাদ দিয়ে সমস্ত কাহিনী একে একে বলে গেল। তারপর বলল, তোমাকে বলে রাখছি রাজু, আজ না হয় নাই হল, কিন্তু ঠাকুর-পুরুত সাক্ষী রেখে এ বিয়ে হবেই হবে। নইলে আমি বাপের বেটা নই।

শান্ত কঠিন কণ্ঠে শোভা বলল, বিয়ে কবার হয়, ফটিক?

ফটিক মুখ ফিরিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে শোভার দিকে তাকাল।

কমলা শুধু মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি আর কোন কথা তুলো না ফটিক। এ বিয়ে হয়ে গেছে।

ফটিক চুপ করে গেল। একটু পরে পুনরায় প্রশ্ন করল, দাদাবাবু কি শুয়ে পড়েছেন?

কমলা বলল, না, নন্দ তাকে নিয়ে গেছে দুর্গাপুরে।

নন্দ নিয়ে গেছে? ফটিক সোজা হয়ে বসল, তাকে আপনারা যেতে দিলেন কেন। ওদের মতলব একটুও ভাল নয়।

শোভা বলল, তুই ব্যস্ত হোস নে ফটিক—ওঁর দেশ থেকে দাদামশাই এসেছেন বিশেষ কাজে। ওঁর পক্ষে না গেলেই চলতো না। আমি শুধু ভাবছি তাঁদের যত্ন-আত্যি হবে কেমন করে! তুই কাল ভোরে উঠে কিছু খাবার-দাবার নিয়ে চন্দরকে সঙ্গে করে চলে যাস— কমলাকেও পৌঁছে দিস রাণীগঞ্জে। আর কিছু তুই ভাবিস নে! রাজু, ফটিককে খেতে দাও।

রাজু বলল, হ্যাঁ, এই যে বেড়ে দিই। আয় ফটিক।

কমলা আর শোভা সেখান থেকে উঠে ঘরে গেল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠে রাজুকে ডেকে তুলে খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে ফটিক যে কখন বেরিয়ে পড়েছে শোভা জানে না। কমলা অথবা চন্দর কাউকে সে সঙ্গে নেয় নি,—কেন না নানাবিধ সন্দেহে তার মন আলোড়িত হচ্ছিল। গাড়িখানা নিয়ে এসে পরে সে কমলাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে, এইটি স্থির করেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। রাজু যেন ছোট-মাকে কথাটা বুঝিয়ে বলে।

গাড়ি নিয়ে ফটিক যখন আবার বেদেডোবায় ফিরে এল, বেলা তখন বোধহয় দশটা বাজে। মলিন মুখে সে নেমে এসে শোভার সামনে দাঁড়াল।

কি খবর ফটিক? খাবার দিয়ে এলি?

ফটিক বলল, না ওঁদের কারুকে দেখতে পেলুম না ঘরে।

মানে? শোভা চুপ করে দাঁড়াল।

ফটিক বলল, দাদাবাবু ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে কোথায় গেছেন কেউ বলতে পারল না।

শোভা বলল, দাদামশাই আর তাঁর নাতনী—তারা কি করছে?

তাঁদের কারোকেই আমি দেখতে পাই নি।

শোভা কি ভেবে নিজের ঘরে ঢুকল, মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়াল, তারপর কাপড়চোপড় ও সাজসজ্জা বদল করে স্টিলের

আলমারিটা একবার খুলল, টানাটা টানল, তারপর কতক্ষণ ধরে ভ্যানিটি-ব্যাগে কি যেন সব ভরে নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, রাজু, এসব রইল, কিছু ভেব না —আমি একবার নিজেই যাই। এস কমলা, তোমাকে আমি নামিয়ে দিয়ে যাব। ফটিক, স্টার্ট দে গাড়িতে।

রাজু নিরুপায় চোখে কাঁদছিল একপাশে দাঁড়িয়ে। ফটিক ওদের নিয়ে গাড়ি চালিয়ে আবার চলে গেল। শোভা শুধু মাঝখানে একবার বলল, আরেকটু জোরে চালা ফটিক।

কমলা বলল, কাল থেকে তুমি কিছু খাও নি শোভাদি—ওখানে গিয়ে কিছু মুখে দিও।

শোভার মুখের উপর কোথায় যেন একটা কঠোরতার ছাপ পড়েছিল, সেটার কাঠিন্য উপলব্ধি করা কমলার পক্ষে সম্ভব নয়। শোভা বলল, হ্যাঁ, দেব বইকি। না খেয়ে কি আর থাকব? তবে কি জান কমলা, এবার ভাল করে জানতে হবে—আধমরা হয়ে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল কিনা—

কিছুক্ষণের মধ্যেই বড় রাস্তায় গাড়ি এসে পৌঁছল। কমলা বলল, আমি এখানেই নামি শোভাদি—বাসে যাওয়াই আমার সুবিধে। আরেকদিন সময়মতো তোমার কাছে আসব।

গাড়ি থামিয়ে ফটিক কমলাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। গলা বাড়িয়ে শোভা কেবল বলল, নিশ্চয় এস একদিন কমলা।

আধ ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় লাগল রমেনের ঘরের সামনে এসে পৌঁছতে। আজ ছুটির দিন নয়। ক্যাম্প ও ব্লক সব খালি, সবাই গেছে কর্মস্থলে। কিন্তু ফটিকের খবর মিথ্যে নয়—ঘরটি শূন্য। ছেঁড়া কাগজ আর চৌকি ও টেবিল পড়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে—জানলায় মুখ বাড়িয়ে শোভা দেখল। কিছুই বুঝতে পারা গেল না। ফটিক গিয়ে পর পর কয়েকখানা ঘর দেখে এল। চারিদিক শূন্য, কোথাও কিছু নেই।

ফটিক বলল, সামন্ত মশাইকে কি একবার জিজ্ঞেস করে আসব? নন্দ নিশ্চয়ই জানে দাদাবাবু কোথায় গেছেন।

শোভা বলল, তুই সামন্তর কাছে যা, আমি ততক্ষণ এখানে ওখানে একবার খোঁজ করি। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আবার এখানেই ফিরে আসিস।

শোভা গিয়ে আবার গাড়িতে উঠল, এবং গাড়ি ছেড়ে দিল। সঠিক কোথাও তার যাবার নেই। রমেন ছুটিতে রয়েছে, তবু আপিসে গিয়ে খোঁজটা একবার নেওয়া দরকার। শোভা প্রায় মাইল খানেক চালিয়ে রমেনের আপিসের সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে নামল। মেয়েরা সাধারণত এসব জায়গায় আসে না, সেজন্য অনেকেই একটু অবাক হয়ে তাকাল। ভিতরে ঢুকে শোভা সেই সুপরিচিত বড়বাবুটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি আজ একেবারে শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে অভ্যর্থনা করে বসালেন। বললেন, বসুন, আমি সব জানি। কাল অমন ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল আপনার বাড়িতে, আর আজ ঘুরছেন স্বামীর সন্ধানে! বড়ই দুঃখের কথা মিসেস চৌধুরী!

শোভা বলল, আর কিছু বলবেন?

না, বলবার কিছু নেই ত! যা বলবার ছিল শ্রীমান রমেনই সব বলে দিয়ে গেছে! এ কদিনের মাইনেটাও সে নিয়ে গেল না—রিজাইন দিয়ে চলে গেল। এই যে তার চিঠি, আমার টেবিলেই রেখে গেছে। আপনার স্বামীর চেহারাটি বড় রুক্ষু দেখলুম, মিসেস চৌধুরী!

তাঁর কথায় চাপা কদর্য বিদ্রূপ মেশানো ছিল। কিন্তু শোভা একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে বলল, তাঁর ঠিকানাটা আমাকে দয়া করে দেবেন?

বড়বাবু বললেন, দেব বইকি! তবে হ্যাঁ, তিনি বর্তমানে

নিরুদ্দেশ। তাঁর হুগলির একটা যেমন তেমন ঠিকানা আপিসের খাতায় আছে, সেটি আপনাকে দিতে পারি।

একখানা খাতা বার করে পাতা উলটে-পালটে বড়বাবু একটা ঠিকানা দেখে ছোট একটি কাগজে টুকতে টুকতে বললেন, বুদ্ধিমান ছেলে বটে! কনে-বৌয়ের কাছে ঠিকানাটাও চেপে গেছে। .দেখুন, যদি পায়ের দাগ ধরে গিয়ে কোথাও খুঁজে পান। আজকালকার ছেলে ত! হয়ত বৃন্দাবনের কাজ সেরে মথুরায় গিয়ে উঠেছে!

ঠিকানাটা নিয়ে নমস্কার জানিয়ে শোভা বেরিয়ে গেল।

গাড়ি নিয়ে সে যখন আবার কোয়ার্টারের কাছে এসে থামল, দেখল—ফটিক সেই বারান্দার ধারে উবু হয়ে বসে রয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে শোভা এসে দাঁড়াল, বলল, সামন্ত কি বলল রে?

ফটিক বলল, ওই জানোয়ারটার কথা বলতেও আমার ঘেন্না করে। ওই যত নষ্টের গোড়া। কাল আমি যা সন্দ করেছিলুম তাই হয়েছে। যত নোংরা কথা সব তুলেছে দাদাবাবুর কানে।

তা তুলুক, তুই খোঁজ কিছু পেলি কিনা তাই বল।

না, পাই নি। সামন্তর কাছে দাদাবাবু নাকি গোটা কতক টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু সামন্ত দেয় নি! আমাকে ভাগিয়ে দিল।

শোভার চোখ দুটো সহসা ঝাপসা হয়ে এল, কিন্তু সে নিজেকে সংযত করল। ফটিক বলল, কাল যাবার সময় দাদাবাবু কি আর কিছুই বলে যান নি, ছোট-মা?

শোভা বলল, না। শোন্ ফটিক, আমাকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে তুই গাড়ি নিয়ে চলে যা, আমি না ফেরা পর্যন্ত তুই আর রাজু বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাস নে।

আপনি কোথায় যাবেন?

আমি?—শোভা বলল, আমি কলকাতার গাড়িতে উঠব।

ফটিক উঠে দাঁড়াল। আর কোনও কথা তার মুখে এল না। শোভা আবার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসল।

কান্নাটা চাপা রয়েছে ভিতরে ভিতরে, বাইরে কিন্তু তার প্রকাশ নেই। বরং যে-শৈথিল্য ছিল শোভার প্রকৃতির মধ্যে, সেটার উপর আঘাত পড়ে কঠিন হয়ে উঠেছে। চব্বিশ পঁচিশ বছর ধরে যে-জীবনটা তার জানা—এ অভিজ্ঞতা তার বাইরে। পুরুষকে সে জেনে এসেছে এতকাল—কিন্তু পুরুষ বলে নয়, মানুষ বলে। তার চারিদিকে যারা এতদিন ঘিরে ছিল, তাদের সঙ্গে মনের যোগ কোনদিন তার ছিল না, মন মেলে নি কারো সঙ্গে—দুঃখ সুখের সঙ্গী তারা হয় নি। বাইরের মানুষ তারা বাইরেই থেকে গেছে।

কলকাতার ট্রেনে একখানা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে একটি কোণে গিয়ে শোভা বসেছিল। বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে সে যাচ্ছে বটে, কিন্তু যাত্রাটা নিরুদ্দেশ। কি জন্য যাচ্ছে সেটিও তার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হতে পারছে না। যে-ব্যক্তি তার পিছনে কোনও চিহ্ন রেখে যায় নি, কোনও নৈতিক সম্পর্ক স্বীকার করে যায় নি, তার পিছনে অভিযান করা একটু বিচিত্র বইকি। যদি সে দেখা পায় রমেনের, তবে কি সে পায়ে ধরে কাঁদতে বসবে? না, সে সম্ভব নয়। সেখানে মেয়েমানুষের আহত আত্মমর্যাদার কথা আছে। আর যাই হোক, মান খোয়ান চলবে না।

চুপ করে কঠিন হয়ে বসে রইল শোভা। গরলে তার যেন আকণ্ঠ ভরে উঠেছে। সমস্ত জীবনের ভিতর দিয়ে যেন তার একটা ধিক্কার উঠছে। মনে হচ্ছিল, এমন অকারণে এমন বিনা অপরাধে এমন অহেতুকভাবে কেউ কোনদিন এভাবে মার খায় নি। প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগল ব্যাণ্ডেল স্টেশনে পৌঁছতে। কথায় কথায় রমেনই একদিন বলেছিল, ব্যাণ্ডেল স্টেশনে নেমে আন্দাজ মাইল চারেক

গেলে তবে আমাদের গ্রাম। পোস্ট আপিস থেকে কিন্তু অনেক দূর। শোভার একটা ধারণা এই, রমেন বরং না খেয়ে উপোস করে থাকবে, কিন্তু ঘরের কোণ ছাড়া তার চলবে না। তার মন হল ঘরপোষা।

চাদরখানা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে ভ্যানিটি-ব্যাগটি বাঁ হাতে নিয়ে শোভা নেমে এল। কিন্তু কোন্‌দিকে তাকে যেতে হবে কিছুই বুঝতে না পেরে সে ঘুরতে ঘুরতে এল স্টেশন মাস্টার মশায়ের কাছে। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় জানা গেল তিনি ডাকঘরটির নাম শুনেছেন বটে, তবে গ্রামের ওই নামটি তিনি এর আগে শোনেন নি।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর অবশেষে একখানা অতি পুরনো ছ্যাকড়া গাড়ি পাওয়া গেল। সে-লোকটি বুঝি জানে পথ ঘাট। তবে মাঝখানে আছে কাটাখালের উপর কাঠের সাঁকো, তার ওপর দিয়ে গাড়ি কিন্তু যাবে না। ঘুরে যেতে গেলে আরও দেড় ক্রোশ কাঁচা পথ। ঘোড়া সেখানে যেতে পারবে না—গত বর্ষাকালের জলে খানা খোন্দলে এখনও কাদা আছে। আমি আপনাকে কাটা-খালের ধার অবধি পৌঁছে দিতে পারি তিন টাকায়- ওপারে গিয়ে দেড়পো রাস্তা আপনাকে হেঁটেই যেতে হবে।

শোভা কি যেন ভাবল, পরে বলল, বেশ, তাই চল। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, তাদের দেখা না পেলে আবার স্টেশনে ফিরব কেমন করে?

গাড়োয়ান বলল, যদি বলেন তাহলে ঘণ্টা দুই আপনার জন্যে এপারে অপেক্ষা করতে পারি। তিন টাকা ছাড়া আর একটি টাকা আমাকে তাহলে অগ্রিম দিয়ে যাবেন। যদি ফেরেন ভাল, না ফিরলে টাকাটা আমারই হবে। আমার নাম ধনেশ্বর, গাড়ির নম্বর হল ছয়। এদিকে সবাই আমাকে চেনে।

প্রস্তাবটি মন্দ নয়। শোভা রাজী হয়ে গাড়িতে চড়ে বসল। রাস্তাটা পাকা বটে, তবে খোয়া-বাঁধান। লোহার চাকা তারই ওপর প্রচণ্ড শব্দ তুলে এগিয়ে চলল। গাড়ির ভিতরে তোড়জোড় সবই আলগা—ছড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়লে কিছু বলবার নেই। ঘোড়া বেশি দৌড়লে একটু যেন ভয়-ভয় করে।

হেমন্তের বেলা প্রায় চারটে বাজে। গাছপালায় এরই মধ্যে রোদ উঠেছে। ভয় কিছু নেই অজানা পথে—সেখানে শোভা দৃঢ়। কিন্তু দুর্ভাবনা আছে বইকি। রমেনের দেখা যদি না পাওয়া যায়, তবে তার নিজের ভবিষ্যৎটা ঠিক কি প্রকার দাঁড়াবে, বলা কঠিন। হয়ত তাকে বেদেডোবার বাসও তুলে দিতে হবে। হয়ত এমন একটা জীবনের রীতি তাকে গ্রহণ করতে হবে, যেটার সঙ্গে আজও তার পরিচয় ঘটে নি। সেটা কি প্রকার জানা নেই—সমস্তটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তার স্পষ্ট চেহারা মনেও আসতে চায় না। স্থির হয়ে সে বসে রইল।

গাড়ি চলেছে কোন দিকে, শোভা কিছুই জানে না। কেবল তার উৎকণ্ঠিত দুই চক্ষু বন বাগানের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে গাড়ি এল অবশেষে সেই কাটা-খালের ধারে। নিকটে দূরে কোন কোন ঘরে তখন সন্ধ্যার আলো জ্বলেছে। কাছেই বোধ করি হাটতলা। গাড়ি সেখানে এসে দাঁড়াল। গাড়োয়ান বলল, আমি কি খানিকটে এগিয়ে দিয়ে আসব?

শোভা বলল, যদি আসতে পার ত ভালই হয়।

চলুন তবে—পোল পেরিয়ে এক পো রাস্তা গেলেই মাসুন্দি। কার বাড়ি যাবেন বলুন ত?

শোভা কি যেন ভেবে বলল, হরমাধব ভটচার্যির বাড়ি।

গাড়োয়ান বলল, হরমাধব? গোঁসাইগুষ্টির মামা? চলুন, আমি জিজ্ঞেস করি ওই দোকানে।

পোল পেরিয়ে কিছুদূর এসে ধনেশ্বর আগে ভাগে গিয়ে একটি মুড়ি-বাতাসার দোকানে কি যেন জিজ্ঞেস করল, তারপর ফিরে এসে বলল, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি, --বারোয়ারিতলার কেত্তন ভট্চায! এই ত কাছেই,—আধপো রাস্তা! এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবেন গোঁসাইকালীর পুরনো মন্দির, তারই পাশে ওদের ভিটে।

শোভা তার ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে চারটি টাকা বার করে ধনেশ্বরের হাতে দিয়ে বলল, ওদের দেখা না পেলে এখুনি আমি ফিরে আসব। তুমি থেকো, কেমন?

আপনার কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আমি হাটতলাতেই আছি। যদি দেখি আপনার দেরি হচ্ছে, আমি খবর নিয়ে তবে যাব। একটু সাবধানে যাবেন মা, এদিকে সাপখোপের বড্ড উৎপাত।

শোভা ঘাড় নেড়ে খরপদে পা বাড়াল। মন্দ নয়, প্রকাণ্ড গোখরো সাপ সহসা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে যদি তাকে ছোবল মারে, সে-মৃত্যু কাম্য বইকি। অসম্মানের হাত থেকে সেই মুক্তি ত সৌভাগ্যের কথা! সুতরাং ধনেশ্বরের কথাটা গ্রাহ্যই করল না শোভা—জনবসতি-বিরল মাঠের ধার দিয়ে বনবাদাড়ের পাশ কাটিয়ে সে সোজা চলতে লাগল।

এক জায়গায় এসে সে থমকে দাঁড়াল। অদূরে স্তূপাকার পুরনো ইঁট আর ঝোপজঙ্গলের পাশে এক বেড়ার ভিতর দিয়ে দেখা গেল, একটি মেয়ে হারিকেন হাতে নিয়ে বোধকরি কুয়োতলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শোভা দ্রুতপদে এল বেড়ার দিকে। বাইরে দাঁড়িয়েই ডাকল, শোনো ভাই---।

মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে তাকাল। পরে কয়েক পা কাছাকাছি এসে চোখ তুলে শোভার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলল, কাকে চান?

এটা কি হরমাধববাবুর বাড়ি?

হ্যাঁ, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

আসছি অনেক দূর থেকে। তোমারই নাম কি রেবা?

হ্যাঁ—আসুন আপনি ভেতরে।

শোভা ভিতরে এসে ঢুকল। তারপর এগিয়ে এসে রেবার কাঁধে হাত রেখে বলল, তোমরা না কাল দুর্গাপুরে গিয়েছিলে? আজ কখন ফিরলে? আমি সেখান থেকেই আসছি।

দুজনে এসে বারান্দায় উঠল। ভারী সুশ্রী মিষ্টপ্রকৃতির মেয়ে রেবা। শোভাকে আসন পেতে বসিয়ে সে বলল, দাদু আর আমি গিয়েছিলুম রমেনদার ওখানে। কালই আমরা ফিরতুম, কিন্তু রমেনদা এলেন অনেক রাত্তিরে, তাই ফেরা হল না।

রমেনবাবু তোমার কে হন্?—শোভা জানতে চাইল।

রেবা বলল, না, কেউ হন না বটে, তবে আমাদের বাড়ি হল পাশাপাশি। ওঁদের ঘরদোর এখন আর কিছু নেই। ওই ওদিকে ওঁদের পুরনো ভিটে আর জমি পড়ে আছে। ওঁদের ত আর কেউ নেই।

তিনি কোথায়?

কে, রমেনদা? ওই যে, খেজুরতলার ওদিকের ঘরে। আমি আলোটা দিতে যাচ্ছিলুম।—আপনি বসুন, আমি দাদুকে ডেকে দিই। এই বলে আলোটা সামনে রেখে রেবা চলে গেল।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই ঠুক ঠুক করে এক বৃদ্ধ এসে হাজির হলেন। শোভা উঠে গিয়ে পায়ের ধুলো নিল। বৃদ্ধ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, দুর্গাপুর থেকে তুমি এসেছ শুনলুম, কিন্তু তোমার আর কোনও পরিচয় ত জানি নে, মা?

শোভা সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে বলল, যে-নাতিটি আপনার সঙ্গে এসেছেন, তিনি সামনে থাকলেই পরিচয় দিতেন।

ও, তা বেশ বেশ—বোধহয় আমার কাছে বলতে লজ্জাই পাচ্ছ। তা এসে ভালই করেছ, মা। কতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে ?

নতমুখে শোভা জবাব দিল, এই সম্প্রতি—

রেবা হাসিমুখে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। হরমাধববাবু আবার বললেন, অনেকদিন ধরেই দুর্গাপুরে যাব-যাব করছিলুম। রমেনের বাপ একটা দেনা করে গিয়েছে, সেই দেনাটা আর শোধ হয় নি। ওই ভিটেমাটিটুকু লিখিয়ে না নিলে এ মেয়েটার বে'থাও দিতে পারছি নে। রমেনের হাতের সই দরকার ছিল কিনা—

শোভা বলল, হ্যাঁ, এ কথা আমি শুনেছিলুম বটে।

বৃদ্ধ বললেন, মেয়েটার বিয়ের জোগাড় করেছি এই সামনের মাসের তিন তারিখে। তাই যেতে হয়েছিল রমেনের ওখানে। কিন্তু ছেলেটা সেই সকাল থেকে জ্বরে পড়েছে, সারাদিনই শুয়ে রয়েছে। যা রেবা, নাতবউকে ঘরটা দেখিয়ে দে—। তুমি এসে পড়েছ, আমি নিশ্চিন্ত হলুম—

আসুন—বলে রেবা আলোটা নিয়ে উঠোনে গিয়ে নামল।

কুয়োতলার পাশ কাটিয়ে খেজুরগাছটা ছাড়িয়ে পুরনো ভিটে পেরিয়ে যে ঘরখানা পাওয়া গেল, সেখানাকে গোলপাতার ঝোপড়া বললেই হয়। দরজাটা খোলাই ছিল, এবং সেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে নড়বড়ে একখানা চৌকির উপর কাঁথামুড়ি দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে যে-ব্যক্তি, তাকে দেখলে কান্নাই পায়।

চাপা কণ্ঠে রেবা বলল, ঘুমোচ্ছেন! আলোটা এখানে রইল, পরে আবার আমি আসব।

রেবা চলে যাবার পর শোভা চৌকির মাথার দিকে এসে কিছু-ক্ষণ দাঁড়াল। ঝুপসি ঘর, থেকে থেকে পোকামাকড়ের শব্দ হচ্ছে। এক পাশে দু-একটা ভাঙা কাঠের বাক্স, তারই পাশে

রমেনের পরিচিত টিনের স্যুটকেশ আর সেই চটাওঠা কলাইয়ের গেলাস। জলের কলসী একটা জুটেছে কোত্থেকে। চেয়ে-চেয়ে শোভা দেখল, এ-ঘরে কোনমতেই মানুষের পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই বৃদ্ধ লোকটি কেবলমাত্র আপন স্বার্থোদ্ধারের জন্য রমেনকে এখানে এনে ফেলেছে, এটি সুস্পষ্ট। এদিক ওদিক দেখে শুনে বিমূঢ়ের মতো শোভা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হাতখানা বাড়িয়ে রমেনের কপালে রেখে অনুভব করার চেষ্টা করলো, জ্বর কতটুকু।

ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়াতেই রমেনের আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। সামনে আলো দেখে বলল, কে? ও, তুমি?

শোভা জবাব দিল না। শুধু হাতখানা রমেনের কপালের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে রইল।

রমেন একবারটি পাশ ফিরল। বলল, কেমন করে পথ চিনে এলে? হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে নয়, আমি তোমাকে না জানিয়ে চাকরিও ছেড়েছি, পালিয়েও এসেছি।

এবার আর জবাব না দিয়ে পারা গেল না। শোভা স্থির কণ্ঠে বলল, পালিয়ে এসেছ কেন তা বুঝি। কিন্তু চাকরি ছেড়ে এলে—ভাত জুটবে কোত্থেকে?

রমেন একটু কাৎ হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। বলল, সহজে জুটবে না জানি, তবে চেষ্টা করব বইকি। আমার ওই পালিয়ে আসার মধ্যেই আসল কথাটা ছিল—ওসব ঝামেলা সহ্য করবার মতন কোমরের জোর আমার নেই। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমি একলা ঘরের কোণে শান্তিতে পড়ে থাকতে চাই।

রমেন আবার শুয়ে পড়ে কাঁথাটা টেনে নিল। পুনরায় বলল, ঠাণ্ডায়-গরমে ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরেছে। এমন কিছু অসুখ আমার হয় নি। শুধু মাথার যন্ত্রণা—

শোভা তেমনি অবিচল কণ্ঠে বলল, ভয় নেই তোমার, আমি সেবা করতে আসি নি। পায়ে ধরে কাঁদতেও পারব না।

রমেন একটু হাসল। বলল, তাহলে ঘুমোবার আগে একবারটি জানিয়ে যাও, তুমি সন্ধ্যেরাত্রে বাড়ি চড়াও হলে কেন? তোমার এখানে আসবার কথা ত ছিল না।

শোভা বলল, তোমার মাথার যন্ত্রণায় উত্তেজনা বাড়ুক, এ আমি চাই নে। আমি শুধু এসেছি তোমাকে আগাগোড়া জানতে। তোমাকে ভাল করে জানলে পৃথিবীসুদ্ধ পুরুষকে আমার জানা হবে।

চোখ বুজে রইল রমেন। কিছুক্ষণ পরে সে বলল, বিয়ে ত আমাদের হয় নি। আমি যদি দুর্গাপুর আর রাণীগঞ্জের সাংঘাতিক ফাঁদ কেটে পালিয়ে আসতে পেরে থাকি, সে ত আমার অপরাধ নয়। তুমি আমাকে দোষ দিতে পার না। সামন্তর সব জোচ্চুরি জালিয়াতি সত্যি, কিন্তু তোমার আসল পরিচয়টা ত মিথ্যে নয়।

শান্ত কণ্ঠে শোভা বলল, আমার আসল পরিচয়! সেটা কি তোমার চেয়েও মন্দ?

চোখ চেয়ে রমেন আবার হঠাৎ উঠে বসল। বলল, তোমার একথার মানে?

হারিকেনটায় অত্যন্ত শিষ উঠছিল, সেটা ঈষৎ কমিয়ে দিয়ে শোভা একবার বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। পরে বলল, রাগ কোর না—এ-জীবনে কোনদিন কোথাও তুমি সৎশিক্ষা পাও নি, এই তোমার সকলের বড় কলঙ্ক। মানুষের জন্ম-ইতিহাস বড় নয়—জ্ঞান বিদ্যে বিবেচনা সদাচরণ—এরাই বড়। আমি জানি নে আমার জন্মের মূল কাহিনী, যেমন কেউই জানে না—কিন্তু সে-কাহিনী ইতিহাসে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে না, সব মুছে যায়—শুধু কীর্তি কখনও মোছে না। আমি কেবল জন্মের

গৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই নে, আমার সত্যের জোরেই দাঁড়াতে চাই।

শোভার দুই চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছিল।

রমেন বলল, বেশ ত, আমি মানা করি নি! তোমার ক্ষেত্র অবারিত রয়েছে; শুধু আমাকে আমার বিশ্বাস আর সংস্কার নিয়ে একপাশে পড়ে থাকতে দাও।

বাইরে রেবার সাড়া পাওয়া গেল। অন্ধকারের থেকেই সে এগিয়ে এসে ঘরের সামনে হাসিমুখে দাঁড়াল। হাতে তার একটি দুধ-বার্লির বাটি। বলল, বউদিদি, আপনি এসেছেন শুনে পিসিমা খুব খুশী হয়েছেন। এবার রমেনদাকে একটু খাওয়ান ত! সারাদিন আজ উনি কিচ্ছু খান নি।

শোভা এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বাটিটা নিল। রেবা পুনরায় বলল, রমেনদা আমাদের শাসিয়ে রেখেছেন যে, কাল কাজকর্ম সেরে অসুখ শরীরেই উনি চলে যাবেন।

শোভা সহাস্যে বলল, তুমি জান না ভাই, এরোপ্লেনে উনি সীট রিজার্ভ করে রেখেছেন, কাল সকাল হলেই বিলেত রওনা হবেন।

সত্যি?—রেবা বড় বড় চোখে তাকাল।

• শোভা বলল, দেখছ না, মেজাজ-মর্জি অনেকটা যেন সেই রকম।

রেবা বলল, ও, আমাকে বুঝি ঠকান হচ্ছে? রমেনদা পথ্যি না করে এখান থেকে এক পা-ও নড়তে পারবেন না। বউদিদি, পিসিমা বলে দিলেন, আমাদের রান্না হতে দেরি নেই। আর রাত্তিরে আপনারা ওবাড়ির পশ্চিমের ঘরটায় থাকতেও পারবেন। এ ঘরে কেউ থাকে না।

রমেন বলল, পিসিমাকে গিয়ে বল রেবা, আমি এ ঘরে বেশ

আছি। আর এঁকে অবিশ্যি তোমাদের ওদিকে নিয়ে যেতে পার। আমার নিজের এখানে কিছু অসুবিধা হবে না।

আমি গিয়ে বলছি পিসিমাকে—বলতে গিয়ে রেবা ফিক করে একটু হাসল, পুনরায় বলল, পিসিমা কিন্তু শুনবেন না।

সপ্রতিভ সতের বছরের মেয়েটি ফুড়ুক করে বেরিয়ে গেল।

আবহাওয়াটা আবার তেমনি সুকঠোর চেহারায় দেখা দিল। বার্লির বাটিতে চুমুক দিয়ে রমেন সেটাকে সরিয়ে রাখল। শোভা বলল, আমি ওঁদের ওদিকে গিয়েই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু কাল সকালে চলে যাবার সময় আমাকে সব কথা বলে যেতেই হবে।

মুখ ফিরিয়ে রমেন প্রশ্ন করল, তুমি ভয় দেখাতে এলে, না প্রতিশোধ নিতে এলে? ওই ভাবে চলে গেলে আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে?

শোভা ঈষৎ উত্তেজনার সঙ্গে জবাব দিল, রুগ্ন স্বামীকে এই নোংরার মধ্যে ফেলে রেখে এখনই যদি চলে যাই তাতেই কি তোমার মান থাকবে? না, মুখ দেখাতে পারবে?

আমি ত তোমাকে যেতে বলি নি!

তাহলে যে-পায়ে লাথি মারছ, সেই পা ধরে থাকতে বল? মেয়েমানুষের আত্মসম্মান গেলে আর কিছু থাকে তার?

রমেন বলল, আমি একটু সুস্থ হয়ে তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে কলকাতায় চলে যাব।

ততক্ষণ?—জবাব চাইল শোভা—ততক্ষণ পর্যন্ত কি তোমার রক্ষিতা হয়ে থাকব?

রমেন জবাব দিল না। শোভা আহত বাঘিনীর মত বলল, এবার বুঝতে পারছ যে, বোকেন মুখুজ্যে তোমার মতন মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ ছিল না। জাত বিচার, ধর্ম বিচার, সতীত্ব বিচার—

কোনটাই সে করে নি। দেশশুদ্ধ সবাই তাকে বলেছে, ডাকাতে-মুখুজ্যে—কিন্তু ইতিহাস একথা বলেছে, মেয়েমানুষকে এত বড় সম্মান স্বয়ং রামচন্দ্রও দেন নি।

রমেন তার মুখের দিকে অপলক চক্ষে তাকিয়ে কি যেন একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় আবার রেবার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সে বলল, বউদিদি, আপনি বুঝি গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসেছেন, গাড়োয়ান তাই জানতে এসেছে। আপনি কি যাবেন?

পলকের মধ্যে সমস্তটা অনুধাবন করে রমেন বলল, ওকে দাঁড়াতে বল রেবা, আমি গিয়ে বলছি—

আচ্ছা—

শোভা বলল, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমার যা জানবার তা জানলুম। পিসিমাকে তুমি বুঝিয়ে বলো। আমি চলেই যাচ্ছি। না না, আমাকে যেতে দাও—এর চেয়ে বরং—

শোভা পা বাড়াতে গেল, কিন্তু বাধা দিয়ে রমেন বিছানা ছেড়ে উঠল। বলল, না, সে হবে না। সমস্ত ব্যাপারটা ভয়ানক ঘুলিয়ে উঠবে। আমি নিজেই যাচ্ছি—ও গাড়ি নিয়ে চলে যাক—

রমেন ঘর থেকে রেরিয়ে গেল।

• ••

পিসিমা তাঁর যত্ন ও সমাদরের কোনও ত্রুটি করলেন না। হরমাধববাবু ও রেবা আন্তরিকভাবে শোভাকে বসিয়ে গল্পগুজব করলেন। আহারাদির ব্যাপারটা কোনমতে সারতেই হল। অতঃপর সব কাজ মিটিয়ে আলোটা হাতে নিয়ে শোভা যখন আবার এসে এ-ঘরে ঢুকল, রমেন তখন দুর্বল শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছে। আলোটা নিঃশব্দে একপাশে কমিয়ে রেখে শোভা চুপ করে একবার দাঁড়াল।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে বিবাহবাসর নষ্ট হয়ে গেছে। কোনও জনসমাজ সেই ব্যর্থ বিবাহ দেখবার জন্য উপস্থিত ছিল না, বরং সবাই জানে এ বিবাহ হয় নি। কমলা কেবল কাঠের আগুন জ্বালিয়ে সেই আভায় দেখে নিয়েছিল ওদের মুখ। অগ্নিদেবতা এবং স্বাহা ছাড়া আর কোনও সাক্ষী ছিল না।

তাহলে আর কোথায় এ বিবাহের স্বীকৃতি রইল? জনকয়েক ভুরিভোজী মেয়ে-পুরুষ, কয়েকটা মৌখিক মন্ত্র, পাথরের একটা নুড়ি আর কাঠের আগুন! এগুলো অর্থহীন, এগুলো সুলভ উপকরণ— তবে কি এদেরই ভরসায় দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েমানুষের চিরদিনের নিরাপত্তা? তবে কি কয়েকটা নিমন্ত্রিত ব্যক্তির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে নারীর জীবনের প্রকৃত ভবিষ্যৎ? কতকগুলো প্রশ্ন ঠিক যেন একটা বিপ্লব বাধিয়ে তুলল শোভার মনে। আলোটা আর একটু কমিয়ে আবছায়া অন্ধকারে মাটির মেঝের উপর বসে সে স্তব্ধচক্ষে রমেনের নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে রইল। না, চিনতে সে পারে নি রমেনকে—পুরুষকে কোনকালেই কোনমতেই চেনা যায় নি। এ নিয়ে অভাগীরা যুগে যুগেই চোখের জল ফেলে গেছে।

শোভার চোখে জল গড়িয়ে এল।—

রাত কত বলা কঠিন। বোধ করি মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। গেছো ইঁদুর অথবা সরীসৃপের কিছু একটা আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভাঙলো রমেনের। চোখ মেলে অন্ধকারে সে তাকাল। ঘরখানা যেন ভারি বোধ হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বে। সে ঘাড় ফেরাল। বালিশের পাশে কি যেন একটা জিনিসে হাত পড়ল। তার নিজের কাছে ছিল টর্চ। টর্চটা সে জ্বেলে দেখল, এটা শোভার ভ্যানিটি ব্যাগ। আলোটা ঘুরিয়ে সে শোভার মুখের উপর ফেলল। কপালের সীঁথিমূলের দিকে তার চোখ পড়তেই আবার আলোটা সে বন্ধ

করল। কিন্তু কৌতূহল গেল না। নিঃশব্দে সে শোভার মাথার উপর পুনরায় টর্চটা টিপে ধরল। না, ভুল হয় নি। গতরাত্রির সেই কাঠের আগুনের একটি শিখা শোভা আপন সীঁথিমূলে বহন করে এনেছে। সেই রক্তিম শিখা যেন জ্বেলেছে আপন ললাটে। আপন সত্যের অমোঘ চিহ্ন থেকে সে বিচ্যুত হয় নি। সিঁদুরের শিখাটা যেন দপ দপ করে জ্বলছে।

আলোটা বন্ধ করে সে সেই ঝুপসি রুদ্ধশ্বাস ঘরখানার বুকচাপা অন্ধকারের দিকে লোল রুগ্ন দৃষ্টি বিস্ফারিত করে তাকাল। না, অত অন্ধকার মনে হচ্ছে না। ওই সীঁথিমূল থেকে উঠে উজ্জ্বলন্ত রক্ত-শিখাটা যেন অন্ধকারে অগ্নিপতঙ্গের মত ঘরের সর্বত্র বিচরণ করে ফিরছে।

জ্বরটা বোধ হয় ছেড়েছে অনেকটা, মাথাটা হাল্কা মনে হচ্ছে। বিছানার মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি আছে, যেমন অস্বস্তি আছে তার এই রুগ্ন জীবনে। রাতটা অবশ্যই এক সময় পোহাবে, কিন্তু প্রভাতকাল থেকে যে-পৃথিবীর মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে, তার চেহারাটা ভাবলে ভয় করে। মিথ্যা, অশুচিতা, ধিক্কার, পরাজয় এবং শোচনীয় একটা দুর্গতি—সমস্তগুলো যেন তারই অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপন আপন পাওনা নেবার জন্য। ওরা-যেন কাঙালীর দল। কেউ বিকলাঙ্গ, কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভরা, কেউ অন্ধ, কেউ উপবাসে শীর্ণ, কেউ বা কদর্য বীভৎস গলিত-ক্ষতে ভয়াবহ। ভয় করে ওরা যখন হাত বাড়ায়! শুধু আজ নয়, ওরা রমেনকে ঘিরে রয়েছে চিরজীবন। তার বিশ্বাসের মধ্যে সত্যের দৃঢ়তা নেই, নৈতিক বিবেচনার মধ্যে মহৎ বিদ্যার জোর নেই, বলিষ্ঠ কোন আদর্শের দ্বারা কোনোকালে সে অনুপ্রাণিত হয় নি,—শুধু তার দুর্গত ধিকৃত জীবন একটা প্রাচীন সংস্কারের বদ্ধ জলার দুর্গন্ধে এতকাল ধরে কিলবিল করে এসেছে। গুহাবাসী আধ-মানব যেন

আনগ্ন আদিম বৃত্তি নিয়ে মাঝে মাঝে বাইরের আলোয় অন্ন খুঁটে খেয়ে আবার ফিরে গিয়েছে আপন গুহায়!

রমেনের রুগ্ন চক্ষু আবার বন্ধ হয়ে এল।

না, স্থির থাকতে তাকে দিল না। বুনো জন্তু অন্ধকার গহ্বরে শুয়ে আপন ক্ষতকে লেহন করতে থাকবে—এই অস্বস্তি তার যেন আর সইছে না। রমেন উঠে বসে নিজের মাথাটা একবার নেড়ে দেখল। না, জ্বর বোধ হয় নেই। টর্চটা নিয়ে আবার সে জ্বালল। শোভার উপরে সেই আলো ফেলে দেখল, একান্ত নিশ্চিন্ত নিদ্রায় সে অচেতন। অতি কাছাকাছি রয়েছে সে, কিন্তু যেন সসাগরা পৃথিবীর ব্যবধান দুইয়ের মাঝখানে।

রমেন হেঁট হয়ে শোভার একখানা হাতের উপর চাপ দিয়ে ডাকল, শুনছ? শোভা?

শোভা চোখ খুলে তাকাল। তারপর উঠে বসে টর্চের আলোটা দেখে বলল, তুমি ঘুমোও নি?

না, তুমি ঘুমোতে দাও নি! খাবার জল একটু দেবে? এই যে দেশালাই, আলোটা একবার জ্বাল ত!

দেশালাই নিয়ে শোভা হারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালল। তারপর ঘরের কোণ থেকে কলসীর জল গড়িয়ে রমেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একটু ভাল মনে হচ্ছে?

জ্বর বোধ হয় কমেছে—বলে রমেন জলটুকু খেল, পরে বলল, তুমি জেগে থাক, আর ঘুমিয়ো না।

শোভা হাতখানা বাড়িয়ে রমেনের কপাল পরীক্ষা করে বলল, হ্যাঁ, ভালই মনে হচ্ছে। জ্বর বোধ হয় আর বাড়বে না।

শোভা?

শোভা মুখ তুলে তাকাল। রমেন বলল, তুমি কি আমার ওপর ঘেন্না নিয়েই কাল চলে যাবে?

শোভা বলল, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে এই কথাই বুঝবে, আমিই তোমার ঘেন্না মাথায় তুলে নিয়ে গেছি!

রমেন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, আর কি কোনও পথ নেই?

পথ!—শোভা একটু থমকিয়ে বলল, হ্যাঁ, বোধ হয় আছে।

কি বল ত?

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম বেদেডোবার বাড়ি ছেড়ে কোথায় কোন্ দেশে যেন একলা চলে গেছি···কেউ আমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। স্বপ্নটা সত্যি হলে আমার দুঃখ থাকবে না।

রমেন চুপ করে গেল। শোভা পুনরায় বলল, অসুখ শরীরে রাত আর নাই জাগলে? আমার জন্যে আর ভেবো না, আমার ভবিষ্যৎ আমি ঠিকই খুঁজে নেব। শুধু একটি অনুরোধ করি। তোমার এই ভিটেমাটিটুকু ওদের নামে লিখে দিয়ো না। এটুকু তোমার থাক্, হয়ত এখানেই তোমাকে এসে একদিন আশ্রয় নিতে হবে!

রমেন বলল, কেত্তন ভটচার্যির বড্ড ইচ্ছে, এটুকু আমি ওদের নামে লিখে দিয়ে যাই। আমাকে ধরেও এনেছে তাই জন্যে। তা ছাড়া হাজার টাকায় এ-জমি বন্ধক আছে, সুদে আসলে এখন প্রায় দুহাজার টাকা। লিখে দিলে দেনার দায় থেকেও বাঁচি।

তোমার উপায়?—শোভা জানতে চাইল।

অসুস্থ রমেনের গলাটা বোধ হয় একটু ধরে এল। বলল, সে-কথা জানবার জন্যে তুমি ত আমার সঙ্গে থাকবে না?

সে সত্যি। —আচ্ছা এবার শুয়ে পড়।—

হাত বাড়িয়ে শোভা আলোটা নিবিয়ে দেবার উদ্যোগ করতেই রমেন যেন ককিয়ে উঠল, তুমি কি আমার মুখ দেখতেও আর চাও না, শোভা?

আলোটা শোভা অকম্প হাতেই নিবিয়ে দিল। তারপর

বলল, না, চাই নে! দুর্বলের চোখে জল দেখলে পাছে আমারও কান্না পায়---তাই আলোটা নেবানই থাক্। তুমি ঘুমিয়ে পড়।

আমাকে তুলে ধরার দায়িত্ব কি তোমার ছিল না?

শোভা উত্তেজিত হল। বলল, কলঙ্কের কাদায় যাকে লাথি মেরে ডুবিয়ে দিচ্ছ সে তোমাকে তুলবে? এর পর তোমাকে কেমন করে বিশ্বাস করব আমি? হয়ত একদিন কার মুখে কি শুনে আমার স্বভাব চরিত্র নিয়েই তোমার সন্দেহ উঠবে। তার চেয়ে গোড়া থেকেই ভেঙে যাক্, ঘুচে যাক এ সম্পর্ক। আমার পথ আমি ঠিকই বেছে নিতে পারব। তোমার পথ খোলা রইল।

ধরা গলায় রমেন বলল, তবে কেন তুমি কপালে সিঁদুর দিলে?

বিয়ে আমার হয়েছে সেই আনন্দে! কপালে সিঁদুর দিয়েছি এই অহঙ্কারে যে, স্বামী আমার আছে!

সে-স্বামী কোথায় তোমার?

আছে আছে, সে তুমি বুঝবে না—শোভা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, তুমি তার সন্ধান কোনও দিন পাবে না। আমার ভাঙা বুকের পাঁজরের মধ্যে সে লুকিয়ে থাকবে চিরদিন। তুমি নিতান্তই ছোট মানুষ, কিন্তু আমার সেই স্বামী ছোট নয়—কোনদিন কোন কারণেই সে আমার চোখে ছোট হবে না। হৃৎপিণ্ডের রক্তে তার পূজো করব চিরকাল।

• •

বলতে বলতে শোভা উঠল। আন্দাজ করে ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে গেল। বাইরের সেই ঝোপঝাড়ের ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের থেকে এক ঝলক স্নিগ্ধ হেমন্তের হাওয়া ঘরে এসে ঢুকল।

কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেও শোভা যখন ফিরল না তখন টর্চ হাতে নিয়ে রমেন বাইরে এল। আলোটা ঘুরিয়ে সে দেখল, দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে শোভা চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। রমেন কাছে গিয়ে তার হাত ধরে বলল, ছি, অমন করে কেঁদো না।

দুঃখ দিয়ে দুঃখই পাচ্ছি, একথা তুমি বুঝলে না, শোভা। তোমাকে ঠকাই নি, শুধু ভয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। সেই ভয় তুমি আমার ঘুচিয়ে দাও। দরিদ্র মন নিয়ে জন্মেছিলুম, কুশিক্ষা বয়ে বেড়াচ্ছি বংশপরম্পরায়—তুমি আমাকে টেনে তোল—সেই আমার গৌরব! অপমৃত্যুর থেকে আমাকে তুমি বাঁচাও।

শোভাকে ধরে রমেন ঘরে নিয়ে এল। তারপর সেই নড়বড়ে তক্তার বিছানাটার ওপর শোভাকে বসিয়ে পুনরায় সে বলল, আলো নিবিয়ে ভালই করেছ, বিয়ের পর কাল রাত্রি এমনি করেই শেষ হোক, শোভা।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে শোভা কাঁদছিল। রমেন গলাটা পরিষ্কার করে বলল, তোমাকে সন্দেহ করার আগে আমার যেন মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এই অন্ধকার কালরাত্রে এই প্রতিজ্ঞা নাও, তুমি আমাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে! ভয়, কুসংস্কার, অশিক্ষা—যা কিছু আমার আছে সব ঘোচাবে। আমাকে এমন করে নোংরায় ফেলে রেখে তুমি চলে যাবে না কোনও দিন!

রমেনের চোখে বোধ করি জল এসেছিল, বাকি কথাটুকু সে আর বলতে পারল না। শুধু একখানা হাত দিয়ে শোভাকে ঘিরে তার কাঁধের উপর মাথা রেখে চুপ করে রইল।

..রমেনের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে শোভা মৃদুকণ্ঠে বলল, ভয় পেয়ো না তুমি, এই ভিক্ষে আমাকে দাও। আমিই তোমার শক্তি, ভুলে যেয়ো না। বেদেডোবার মাঠে গিয়ে দুজনে নামি চল। মাটি কাটব দুজনে—ফলে ফুলে ফসলে ভরবে তোমার-আমার সেই মাটি। ওতেই আমরা সার্থক হব।

শোভা কাছে টেনে নিল রমেনকে। তারপর তার মুখের উপর নিজের অশ্রুসিক্ত মুখখানা রেখে বলল, ভয়ের থেকে অশ্রদ্ধা আসে, পুরুষ হয়ে একথা কেমন করে ভুলেছিলে? এ ত শুধু ঠুনকো

ভালবাসা নয়, আমরা যে স্বামী-স্ত্রী! আগুন যে সাক্ষী রয়েছে, দুজনে দুদিকে সরে গেলে চিরকাল যে ওই আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে।

রমেন শুধু বলল, চল, কালই আমরা বেদেডোবায় চলে যাই।

শোভা শুধু আঁচল দিয়ে সস্নেহে রমেনের মুখখানা মুছিয়ে দিল। পরে বলল, যাব বইকি, তার আগে তোমার এখানকার কাজগুলো আমি মিটিয়ে যেতে চাই।—

বাইরে তখন উষাকালের আভাস দেখা দিয়েছে।

বেলা আন্দাজ নটার সময় স্নানাদি সেরে যখন শোভা এসে হাসিমুখে পিসিমাদের ঘরের বারান্দায় দাঁড়াল, রেবা তখন সামান্য কিছু ফল এবং দুধ-বার্লির বাটি এনে রাখল রমেনের সামনে। জামাটা গায়ে দিয়ে রমেন এসে আসনে বসল। জ্বর তার ছেড়ে গেছে।

বৃদ্ধ হরমাধব খুশী মুখে অদূরে বসে তামাক টানছিলেন। পিসিমা একখানা বঁটি নিয়ে কুট্‌নো কুটতে বসেছিলেন।

শোভা বলল, পিসিমা, কাল থেকে আপনার যত্নের সীমা নেই, রেবারও বিশ্রাম নেই। আজ কিন্তু অত রান্নাবান্নার আর সময় পাবেন না। বেলা বারোটার গাড়িতে ওঁকে নিয়ে আমি যাব। রাস্তা অনেকটা—

হরমাধব বললেন, সে কি ভাই নাতবউ, তা কেমন করে হয়? অবিশ্যি কাগজপত্র সব তৈরি, কিন্তু কাজ ত কিছু হয় নি?

পিসিমা বললেন, এ কি হয় বউমা?

শোভা একটু হাসল। বলল, হাটতলায় সকালে একটি ছেলেকে ধরে পাঠিয়েছি, সে গাড়ি ঠিক করে খবর নিয়ে এখুনি আসবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, আমার স্বামীর আর শ্বশুরের এই ভিটেটুকু

আমি বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারব না, সেইজন্য ওঁকে কাগজপত্রে সই করতে আমি মানা করেছি, পিসিমা। ওটা এখন থাক্—

সকলেই শোভার মুখের দিকে তাকাল। শোভা পুনরায় বলল, এ বাড়ির চৌহদ্দি কিছুদিনের মধ্যেই আমি লোক পাঠিয়ে মাপজোক করে নেব, দাদামশাই। আমার ইচ্ছে, এখানে খান দুই ঘর আর শিবের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

হরমাধব হুঁকোটা রেখে ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠেই বললেন, এ তোমার কেমন আচরণ, নাতবউ? ওকে যদি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ছোঁড়াটা তবে বাপ-পিতাম'র দেনা শুধবে কেমন করে। পিতৃঋণ হল ধর্মের ঋণ—এ কে না জানে!

শোভা বলল, বেশ ত, শোধ উনি করবেন বইকি। তবে আপনি একটু বোধ হয় ভুল করেছেন। আমাকে কিছুই না জানিয়ে ওঁকে ওঁর কর্মস্থল থেকে তুলে এনে এখানে কাগজে সই করিয়ে নেওয়া, এটা ঠিক নয়। সেই জন্যেই আমি মানা করেছি।

পিসিমা এবার একটু রুষ্টই হলেন। বললেন, বাপের দেনা শোধ করতে গেলে বউয়ের হুকুম নিতে হবে কেন, মা?

হাসল শোভা। বলল, এটা ঠিক দেনা শোধ হচ্ছে না পিসিমা, এ যেন দেনার নামে সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে! আপনাদের এখনও বলা হয় নি, এ দেনার সমস্ত টাকাই আমি সঙ্গে করে এনেছি।

রমেন অবাক হয়ে শোভার দিকে তাকাল হতবুদ্ধির মতো। শোভা পুনরায় বলল, এই দেনাটার কথা আর ওঁর দায়িত্বের কথা আমি আগেই জানতুম, সেইজন্যে টাকা আমি আনতে ভুলি নি। কিন্তু এখন দেখছি আধঘণ্টার মধ্যে আপনারা কাগপত্র তৈরি করতে পারবেন না, সুতরাং টাকা আজ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

হরমাধববাবু চাপা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমার সমস্ত ব্যবস্থাটা উল্টে দিয়ে তোমার কি কোন লাভ হচ্ছে, নাতবউ ?

শান্ত কণ্ঠে শোভা বলল, আমি চাই আপনারই লাভ হোক। যত ক্ষতি আপনার হয়েছে, আমি সব পূরণ করে দিতে চাই। আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। এখানে জমি জায়গা যেমন আছে তেমনিই রাখতে চাই, আপনি টাকা নিয়ে ওঁর দলিল ওঁকে খালাস করে দিন্। দেখতে শুনতে সেইটিই ভাল হবে দাদামশাই—

তুমি ভুল করছ, নাতবউ—আমি টাকার জন্যে ব্যস্ত নই আমার দুই ছেলে বাইরে চাকরি করে, মাইনে তাদের অনেক। টাকার গরম আমারও কম নয়। কিন্তু ওদের এই জমিটুকু পেলে সবটা গায়ে-গায়ে শোধ যেত। তা তুমি হতে দিলে না!—হরমাধববাবু শেষের দিকে শুনিয়ে দিলেন, এর নিষ্পত্তি হয়ত আদালতেই হবে।

হাসিমুখে শোভা বলল, বেশ ত দাদামশাই, সেই ত ভাল! আদালতও সাক্ষী থাকবে। আপনার সমস্ত পাওনা টাকাকড়ি আমি আদালতেই জমা করে দেব। তাঁরাই আপনার কাছ থেকে ওঁর দলিলটি খালাস করে ওঁকে ফিরিয়ে দেবেন ?

পিসিমা এবং হরমাধববাবু একই সঙ্গে যখন বিস্ফারিত চক্ষে শোভার দিকে তাকালেন, বাইরের থেকে তখন পাড়ার একটি তরুণ বালক ভিতরে এসে ঢুকে বলল, আপনাদের গাড়ি খালের পারে অপেক্ষা করছে। গাড়োয়ানকে সঙ্গে এনেছি। আর কিন্তু দেরি করবেন না।

হ্যাঁ, এই যাই—নাও, তুমি ওঠ এবার!

রমেন উঠে দাঁড়াল। শোভা বলল, ওকে ঘরটা দেখিয়ে দাও, বাক্স-বিছানা গোছানই আছে, নিয়ে যাক্।

শোভা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল হরমাধববাবুকে এবং

পিসিমাকে। তাঁরা অনুভব করলেন, লকলকে ইস্পাতের ফলা যেন ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠছে।

পিসিমা বললেন, দুটি খেয়ে গেলেই পারতে, মা!

না, পিসিমা। অনেক খেয়েছি কাল থেকে। আপনাদের আদর যত্ন কোনদিন ভুলব না। দাদামশাইকে বলে যাই, আপনার নাতবউয়ের এই আবদারটি রাখুন। আপনি যেদিন আমাদের কাছে খবর পাঠাবেন, আমরা সেইদিনই এসে আপনার সমস্ত টাকাকড়ি শোধ করে সব কাজ সেরে চলে যাব। আচ্ছা, আজ আসি---

রমেন আগেই মালপত্র নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। শোভা দ্রুতপদে এবার বেরিয়ে এল। কাছাকাছি আসতেই রমেন বলল, তুমি আমার মান রাখলে, শোভা। লোকটা বিশ বছর ধরে ফাঁদ পেতে বসেছিল!

কিছুদূর যেতেই পিছন থেকে ছুটতে-ছুটতে রেবা এসে হাজির। বলল, বউদিদি, দাদামশায়ের মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তাই আপনার সঙ্গে তর্ক করছিলেন। উনি বলে দিলেন, একটা দিনস্থির করে উনি বেদেডোবায় চিঠি দেবেন, আপনারা টাকা নিয়ে এসে সব মিটমাট করে যাবেন। আচ্ছা, আমি যাই---

না, দাঁড়াও রেবা---বলতে বলতে শোভা নিজের আঙুলের একটি আংটি খুলে রেবার একটি আঙুলে হাসিমুখে পরিয়ে দিয়ে বলল, আংটি দিয়ে এই দাবি রেখে যাচ্ছি যে, তোমার বিয়েতে নেমন্তন্নে আসব!

রেবা তাড়াতাড়ি দাদা ও বউদিদির পায়ের ধুলো মাথায় নিল। অতঃপর শোভা হাসিমুখে রমেনকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

লেখক-পরিচিতি

"পরীক্ষার ফল বের হবার পর···বন্ধু সমাজের মধ্যে বলাবলি হয়, কেউ যাবে বিলেত, কেউ আমেরিকা, কেউ হবে ইঞ্জিনিয়র।···

"কেউবা অপরকে প্রশ্ন করত, তুই পাশ করে বেরিয়ে কি করবি ?

"খ্রীষ্টান বন্ধু যতীন জবাব দিত, আমি পালাব।

"কোথায় ?

"জাহাজের কুলী সেজে পালাব দেশ ছেড়ে। যে দেশ খুশি !···টাকা জমিয়ে যাব কালিফোর্নিয়া।

"তারপর ?

"তারপর সেখান থেকে প্যাসিফিক পেরিয়ে জাপান। জাপান থেকে সাইবেরিয়া। তারপর বেরিং পেরিয়ে আলাস্কা। প্যাসিফিক পেরিয়ে অষ্ট্রেলিয়া !

"তারপর সে আর জবাব দিত না। বন্ধুরা সবাই পরাজয় স্বীকার করে যে যার পথে চলে যেত। হেদুয়ার উপর নেমে আসত সন্ধ্যা। যতীনের ওই হাতখানা ধরে চলবার জন্য আমি মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠতুম।"

ঘটনাটি সামান্য। কিন্তু এই থেকেই প্রবোধকুমারের ব্যক্তিজীবনের উপরে আলোকপাত হয় অনেকখানি। প্রবোধকুমারের মনের মধ্যে বাল্যকাল থেকে বাসা বেঁধে আছে এক চির-বেদুইন মানুষ। সে-ই তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দেশ থেকে দেশান্তরে, জনকোলাহলের নগর থেকে নির্জন দুর্গম শৈলপথে, মরুভূমিতে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যক্ষেত্রে।···ভ্রমণকালে তিনি থেকেছেন বিচিত্র সব পরিবেশে, দেখেছেন বিচিত্রতর নরনারীকে। সে দেখাকে তিনি সার্থক, সফল করে তুলেছেন তাঁর সূক্ষ্ম কলমের আঁচড়ে। এইজন্যই তাঁর গল্প উপন্যাসের ধরণ অন্যান্য লেখক-লেখিকাদের থেকে পৃথক, বিচিত্র—তাদের পাত্র-পাত্রী এত জীবন্ত—এইজন্যই তাঁর ভ্রমণকাহিনী শুধুমাত্র বিবরণ নয়, তার চেয়ে মহত্তর, ব্যাপকতর কিছু। তাঁর এই কৃতিত্বের মূল্যও তিনি পেয়েছেন—অসামান্য জনপ্রিয়তা !

১৯০৫ সালের ৭ই জুলাই (বাংলা ১৩১২, ২৪শে আষাঢ়) প্রবোধকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তিন ভাই, তিন বোন। প্রবোধকুমার সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বয়স যখন মাত্র কয়েকমাস, সেই সময়ই তাঁর বাবা রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল পরলোক গমন করেন।

সেই সহায়হীন সাতটি প্রাণীর পরিবার তখন আশ্রয় নিল তাঁর দিদিমার পক্ষপুটে। দিদিমা ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বশালিনী এক মহীয়সী মহিলা। তিনি শক্ত হাতে এঁদের তুলে ধরলেন। এই দিদিমার চরিত্র প্রবোধকুমারের জীবনে ও মনে এক বিশেষ প্রভাব রেখে গেছে। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বইগুলিতে বহুবার তিনি এঁকেছেন দিদিমার চরিত্র। দিদিমার কথার মধ্যে মধ্যে ইংরেজী ইডিয়মের অনুপম বাচনভঙ্গি, দিদিমার হিসাবজ্ঞান, বিষয়বুদ্ধি, উদারপ্রাণতার গল্প—আজও প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি করেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিচিত্র, কৌতুকময় চরিত্রের কথা

বলা যেতে পারে। তাঁর মামার—অর্থাৎ দিদিমার সন্তানের কথা। এঁরও ছবি আছে 'তুচ্ছ' বইতে। এই মামাই শেষ জীবনে আবার প্রবোধকুমারকে আশ্রয় করেছিলেন।

চালতাবাগানে কর'দের এক পাঠশালা ছিল। সেখানেই প্রবোধকুমারের বিদ্যারম্ভ। এখান থেকে তিনি যান স্কটিশ চার্চ স্কুলে স্বর্গত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের বদান্যতায়। এই সময় পর্যন্তও দিদিমাই সমস্ত সংসারটির যাবতীয় ভার বহন করছিলেন। দিদিমার কাছে শুধু তাঁরাই ছিলেন না, ছিলেন মামা, মামী, আরও দু-তিন জন মাসী ও তাঁদের ছেলেমেয়ে। এই বহুজনের সংসারটিকে তাঁর দিদিমা মহীরুহের মতই আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু উপার্জনহীন সে পরিবারটির স্বল্প সঞ্চয় যে দিন-দিনই কমে আসছিল, সে খবর বোধ করি দিদিমা ছাড়া আর কেউ জানত না। তিনি যখন ক্লাস নাইনে পড়েন, সেই সময় একদিন দিদিমার বাড়ী বিক্রী হয়ে গেল। একান্নবর্তী সংসারের সব-কটি পরিবার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রবোধকুমারের সাহিত্যচর্চা শুরু হয় তাঁর স্কুল জীবনেই। তাঁর বয়স যখন ১৫।১৬, তখন তাঁর লেখা ছাপার হরফে প্রকাশিত হচ্ছে। ম্যাট্রিক পাশ করে, ১৯২২ সালে তিনি সিটি কলেজে ভর্তি হন। কলেজ-জীবন থেকেই সাহিত্যচর্চা পুরোদমে শুরু হয়। আরও একটি জিনিস তাঁর মনকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানতে থাকে, তা হচ্ছে ভ্রমণলিপ্সা।

প্রবোধবাবু মার সঙ্গে প্রথম হিমালয়ে যান। তখন ১৯২৩ সাল। তখন থেকেই হিমালয় তাঁর মন অধিকার করল। তারপর কতদিন গেছে, আরও কত জায়গায় গেছেন তিনি। কিন্তু হিমালয়ের মায়া আজও তিনি কাটাতে পারেন নি। হিমালয় থেকে ফিরে আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা। এক বন্ধুর সঙ্গে ব্রহ্মদেশে। উদ্দেশ্য—সেখানে চাকরি করে টাকা জমাবেন। সেই টাকায় যাবেন কালিফোর্নিয়া। সেখানে সৌভাগ্য নাকি পথে-ঘাটে ছড়ানো! কিন্তু হায়! ব্রহ্মদেশেই স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সেখান থেকেই হতাশ হয়ে দেশে ফিরতে হল। এই ভ্রমণের কৌতুককর, কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে 'জলকল্লোল' বইটিতে।

দেশে ফিরে এসে প্রবোধকুমার ডাকঘরের চাকরি নিলেন। এই সময়ে ডষ্টয়ভস্কি, গোগোল, তুর্গেনেভ প্রভৃতির রচিত রুশ সাহিত্য তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। ডাকঘরের চাকরি বেশী দিন সইল না। যে বেদুইন-মন বন্ধু যতীনের হাতখানি ধরে চলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত, সেই মনই তাঁকে এক বৃত্তি থেকে আর এক বৃত্তিতে নিয়ে চলল, এক স্থান থেকে স্থানান্তরে।

ডাকঘর থেকে চাকরি ছাড়ার পর, সাহিত্য-সাধনাই হয়ে উঠল জীবনের প্রধানতম অবলম্বন। যখনকার কথা বলছি, তখন সাহিত্য করে অর্থোপার্জন এত সহজ, এত সুলভ হয় নি। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে লিখে যে মূল্য পাওয়া যেত, তার পরিমাণ যৎসামান্য। একটি দিনের কথা—মেঝেতে মাদুর পেতে আধশোয়া অবস্থায় লিখছেন, মাদুরের তলা থেকে একটা কি যেন গায়ে লাগছে। কিন্তু সেদিকে মন দেবার অবসর নেই, লেখা আজই শেষ করতে হবে। লেখার শেষে উঠে বসলেন, দেখলেন গায়ে দাগড়া দাগড়া দাগ। সন্দেহ হল, মাদুর তুললেন, মাদুরের নীচে দেখা গেল একটি তেঁতুলে বিছে।

সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে দুটি সাময়িক পত্রিকা খুব আলোড়ন তুলেছিল—'কল্লোল ও 'কালিকলম'। প্রবোধকুমার দুই কাগজেই লিখতে শুরু করেন। রচনাভঙ্গির নূতনত্বে ও

স্বকীয়তায় সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। অল্পকালের মধ্যেই তিনি কল্লোল-কালিকলম সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন।

এই সময়কার একটি দিনের ঘটনা শৈলজানন্দ লিখেছেন।

"গল্পটি ছাপা হয়ে গেছে পনেরো কুড়ি দিন আগে, জ্যৈষ্ঠের 'কালিকলমে'। গল্পের সঙ্গে লেখকের ঠিকানা ছিল না। কাজেই কাগজ পাঠানো হয় নি। ভেবেছিলাম, লেখক নিজে এসে নিয়ে যাবে, তাও আসে নি। আপিসে বলে রেখেছিলাম, সেই ছেলেটি যদি আসে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।...

"এই লেখকটি সম্বন্ধে এত আগ্রহের কারণ ছিল। লেখাটি ছেলেমানুসী লেখা নয়, লেখবার ভঙ্গীটি চমৎকার। লেখাটি কারও নজর এড়ায় নি। যে পড়েছে, সেই জিজ্ঞাসা করেছে লেখকের পরিচয়।...

"অথচ এতদিন হয়ে গেল, লেখকের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। প্রায় প্রত্যহই এসে জিজ্ঞাসা করি, এসেছিলেন?

"জবাব পাই, না।

"সেদিন বর্ষা নেমেছিল খুব জোর। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দোতলার ঘরে বসে একফালি ঘোলাটে আকাশ আর এক টুকরো বারান্দা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সেদিনও বোধ করি, সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একাকী বসে বসে ভাবছিলাম তারই কথা—

"এমন সময় বাইক ঠেলতে ঠেলতে কুড়ি-বাইশ বছরের একজন যুবক ঢুকলো এসে বরদা এজেন্সিতে।

"—এ হে-হে-হে ভিজে গেলেন!

"বাইকটা দোরের পাশে রাখতে রাখতে ছোকরাটি বললে, তা গেলাম।

"নিঃসঙ্কোচ জবাব।

"—এখানে আসতে হলে হয় বাইক যাবে, নয় আমি যাব।—বাবাঃ, কাঁধে করে ওই বাইক নিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠা কি সোজা!

"এই কথা বলতে বলতে বসল সে এসে আমার পাশে।...ফিকে লাল রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি ভিজে ঢোল হয়ে গেছে। বললাম, খুলে ফেলুন।

"রুমাল দিয়ে মাথার চুল মুছতে মুছতে বললে, দরকার হবে না। পাখার হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে।—কই, আমার কাগজ কই?

"জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকাতেই বললে, আমারই একটি গল্প আপনারা কেটেকুটে তছনছ করে দিয়ে ছেপেছেন। আমার নাম প্রবোধকুমার সান্যাল।

"ভালই হল। আপনাকেই খুঁজছিলাম।

"হাঁ হাঁ করে উঠল প্রবোধকুমার। আপনি নয়, আপনি নয়—তুমি।...

"জিজ্ঞাসা করলাম, গল্পটি কেটেকুটে নতুন করে লিখে যা দাঁড়িয়েছে—সেটা কি তোমার খুব খারাপ লাগল?

"ফট্ করে বলে বসল, তা আর লাগল না? খুব খারাপ লাগল। আমার গল্প আমি চিনতেই

পারলুম না। এবার যদি কাটতে কুটতে হয় মশাই, আমাকে জানিয়ে কাটবেন। আমি কাছে বসে থাকব, আপনি লিখবেন। তবু দেখতে পাব, আপনারা কেমন করে লেখেন।...

"কল্লোল আর কালিকলমকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, প্রবোধ বোধকরি তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম সদস্য। কনিষ্ঠ কিন্তু একনিষ্ঠ।...সাহিত্যের প্রতি প্রবোধকুমারের নিষ্ঠার অভাব কোনদিন লক্ষ্য করি নি। এবং তার এই অবিচলিত নিষ্ঠা, তার এই তপস্যা সিদ্ধি এনে দিয়েছে অচিরকালের মধ্যে। সকলেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে—সর্ব কনিষ্ঠ এই সাহিত্যসেবক আমাদের সকলের চেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।" (কথাসাহিত্য—আষাঢ়, '৬২)

১৯২৭ সালে আবার ডাক এল হিমালয় থেকে। হিমালয় থেকে ফিরে এসে কাশীর ইণ্ডিয়ান প্রেসে চাকরী নিলেন। এ চাকরিও যথারীতি স্বল্পায়ু হল। এখান থেকে চলে গেলেন একেবারে রাওয়ালপিণ্ডি সৈন্যবিভাগের চাকরি নিয়ে। আবার ছাড়লেন চাকরি। এবার আর বাইরে বাইরে নয়, ফিরে এলেন বাংলায়। সাহিত্য সাধনা আবার জোর কদমে চলল।

১৯৩২ সালে প্রবোধকুমার গিয়েছিলেন কেদারবদরী। ফিরে এসে 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক লিখতে লাগলেন 'কেদার-বদরী'র ভ্রমণকাহিনী। নাম দিলেন—'মহাপ্রস্থানের পথে।' ধারাবাহিক প্রকাশ কালেই অসংখ্য পাঠকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেল এই রচনা ও তার লেখক। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লেখককে ডেকে পাঠিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এসব ঘটনা যখনকার, প্রবোধকুমারের বয়স তখন মাত্র সাতাশ।

১৯৩৭ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হলো। প্রকাশকাল থেকেই এর সাহিত্য বিভাগ সম্পাদনার ভারপ্রাপ্ত হলেন প্রবোধকুমার। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত চালিয়ে এই কাজে ইস্তফা দেন। তারপর থেকে আর কোথাও চাকরি করেন নি। এই সময় থেকে তাঁর জীবনে চলেছে সাহিত্য-সাধনা ও ভ্রমণের একচ্ছত্র আধিপত্য।

সাহিত্যকৃতি ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রবোধকুমার আর একটি দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী। অভিনয় ও আবৃত্তিতে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা। আবৃত্তি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি তাঁর কণ্ঠে অতুলনীয়।

তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ, তিনি নিঃসংকোচে অপরের প্রশংসা করতে পারেন। অন্য লেখকের সার্থক লেখার তিনিই সর্বাগ্রে প্রশংসা করেছেন, এ রকম ঘটনা হয়েছে বহুবার। হিমালয়ের সুমহান ব্যাপকতা তাঁর হৃদয়কে ঈর্ষা-কলঙ্ক-মানবীয় গ্লানি থেকে রক্ষা করে উদারপ্রাণ করে তুলেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী, বন্ধুবৎসল, আড্ডাপ্রিয়। তবে জমাট আড্ডার মধ্যেই তাঁর ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সুযোগে যদি তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য করেন, দেখবেন—সেই আড্ডার মধ্যেও তাঁর চির বেদুইন স্বভাব তাঁকে আড্ডার আর সকলের থেকে পৃথক স্বতন্ত্র করে রেখেছে, কি এক বাউল-উদাসীনতা আবিষ্ট করে রেখেছে তাঁকে, যে কোন মুহূর্তেই আড্ডা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, সেখান থেকে যে কোন সুদূরতম স্থানে চলে যেতে পারেন। এই নৈর্ব্যক্তিকতার জন্যই হয়তো তাঁর মনের সন্নিকটবর্তী হবার ক্ষমতা কারও নেই।